দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ১৩ মার্চ, ২০২৩।। ২৮ ফাল্গুন - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

# জম্মু-কাশ্মীরে লিথিয়াম ভাণ্ডার

- আনুমানিক বাজারদর তিন লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো কোটি টাকা
- সন্ধান পাওয়া লিথিয়ামের পরিমাণ আনুমানিক ৫৯ লক্ষ টন
- বিশ্বের লিথিয়াম ভাণ্ডারের ৫ শতাংশ।
- ব্যাটারি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটবে।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৩ মার্চ - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-** KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


## সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ☐ ৫

**মমতা বধির সাজলেও 'এই তৃণমূল আর না' আওয়াজ এখন রাজ্যজুড়ে** ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

**কালো রঙের দোল** ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

**ভারত তার চিরকালীন বৈভব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে** ☐ রাজেশ শুক্লা ☐ ৮

**ভাষাদিবসের মঞ্চ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যবহৃত** ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

**নাগাল্যান্ড নির্বাচন এবং বিজেপির রসায়ন** ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১১

**ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বনেতা মোদী** ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ১৩

**সবার বিকাশে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট** ☐ ড. অনিল কুমার ঘোষ ☐ ১৫

**পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুদেরই স্বীকৃত কোনো দেশ নেই** ☐ জহরলাল পাল ☐ ১৭

**পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত কমলী সোরেনেরও স্থান হলো মেঝেতে** ☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ১৮

**জম্মু কাশ্মীরে লিথিয়াম ধাতুর আবিষ্কার দেশের শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে** ☐ আনন্দমোহন দাস ☐ ২৩

**জম্মু-কাশ্মীরে লিথিয়াম— অর্থনৈতিক ভাবে বিশ্বের পরিচালক হওয়ার পথে ভারত** ☐ রামানুজ গোস্বামী ☐ ২৫

**সাদা সোনায় উজ্জ্বল হবে ভারতের অর্থনীতি** ☐ বিমল শঙ্কর নন্দ ☐ ২৬

**গঙ্গাসাগরের গল্প, পুরাণকথায় গঙ্গাসাগর** ☐ হীরক কর ☐ ৩১

**অমর্ত্য সেন নোবেল লরিয়েট নন** ☐ সমর সরকার ☐ ৩৫

**শ্যামাপ্রসাদের হস্তক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম** ☐ উত্তম মণ্ডল ☐ ৩৬

**বিকল্প জ্বালানির উৎপাদন বাড়াতে সবুজ উন্নয়নে জোর 'সপ্তর্ষি' বাজেটে** ☐ অমিত মাঝি ☐ ৩৭

**নোটবাতিল মোদী সরকারের স্বাধীনতা-পরবর্তী সর্ববৃহৎ আর্থিক সংস্কার** ☐ ড. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় ☐ ৪৩

**নিয়মিত বিভাগ**

**চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০**


গত সপ্তাহের (৬ মার্চ, ২০২৩) স্বস্তিকার প্রচ্ছদটি এঁকেছেন শীর্ষ আচার্য। ভুলবশত তাঁর নামটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—স্বঃ সঃ

প্রকাশিত হবে
২০ মার্চ
২০২৩

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২০ মার্চ
২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## তৃণমূল কি রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাচ্ছে?

ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যস্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মেঘালয়েও তারা আর প্রধান বিরোধী দল নয়। পশ্চিমবঙ্গেও সাগরদিঘি উপনির্বাচনে পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী। স্বভাবতই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে তৃণমূল কি ক্রমশ রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে?
স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা থাকবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। লিখবেন সুকল্প চৌধুরী, ভবানীশঙ্কর বাগচী প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
**INDIAN OVERSEAS BANK**
Branch : **Sreemani Market**
**Kolkata-700 006**

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

# সম্পাদকীয়

## ভারতের লক্ষ্মী লাভ

প্রবীণরা বলিয়া থাকেন, সিংহস্বরূপ উদ্যমী পুরুষরাই লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকেন। এই মুহূর্তে এই কথাটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে একশত ভাগ উপযুক্ত। ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হইয়া তিনি একশত পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনিবার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন। বহু বৎসরের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করিয়া ভারতকে বিশ্বমঞ্চে উন্নত দেশগুলির সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আনিবার যে স্বপ্ন তিনি দেশবাসীকে দেখাইয়াছিলেন আজ তাহা সাকার হইতে চলিয়াছে। বহু পরিকল্পনা, বহু পরিশ্রম করিয়া তিনি দেশকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত করিয়াছেন। ভাগ্য তাঁহার বরাবরই সহায়। তাই লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার সহায় হইয়াছেন। সম্প্রতি কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় সালাল হাইলাম এলাকায় ভূবিজ্ঞানীরা ৫৯ লক্ষ টন লিথিয়াম ধাতুর সন্ধান পাইয়াছেন। ইহা এতই মূল্যবান যে লিথিয়ামকে শ্বেতস্বর্ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। লিথিয়ামের এই বিপুল ভাণ্ডার দেশের অর্থনীতি এবং সবুজ শক্তির প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করিবে বলিয়া মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশের অর্থভাণ্ডারের এক বিশাল পরিমাণ অর্থ লিথিয়াম ও লিথিয়ামজাত ব্যাটারি আমদানি করিতেই খরচ হইয়া যায়। ইহাতে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। শুধুমাত্র চীনের নিকট হইতেই ৮০ শতাংশ লিথিয়াম ব্যাটারি আমদানি করিতে হয়। লিথিয়াম ভাণ্ডারের আবিষ্কারের ফলে ভারত এইবার অর্থনৈতিকভাবেও চীনের সহিত সমানভাবে মোকাবিলা করিতে পারিবে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ শূন্যে গিয়া পৌঁছাইবে। গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে বিশ্বের আর কোনো রাষ্ট্রপ্রধান দৃঢ়তার সহিত এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। তিনি ওই সম্মেলনে বলিয়াছিলেন, ইচ্ছাশক্তিই হইল আসল কথা। ইচ্ছাশক্তি থাকিলেই উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশিদিন সময়ের প্রয়োজন হইবে না। দেশে বিপুল পরিমাণ লিথিয়ামের সন্ধান মোদীর সেই ইচ্ছাশক্তিরই পরিণাম। ইহার ফলেই ভারত জীবাশ্ম জ্বালানির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। সমগ্র বিশ্বই জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানির কথা ভাবিতেছে। সেই কারণেই বিশ্বে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে। এই বৈদ্যুতিক গাড়ির জ্বালানির উৎসই হইল লিথিয়াম। বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, ভারতে লিথিয়াম আবিষ্কারের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে সমস্ত চারচাকা ও দু চাকার গাড়ি ব্যাটারি চালিত হইয়া যাইবে। ইহার কারণেই বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিও প্রায় একশত ভাগ পূরণ হইয়া যাইবে।

নূতন বৎসরের শুরুতেই এই লক্ষ্মীলাভ ভারতের আত্মনির্ভরতার পথকে ত্বরান্বিত করিবে সন্দেহ নাই। ২০১৭ হইতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভারত বিদেশ হইতে বহু কোটি টাকার লিথিয়াম ব্যাটারি আমদানি করিয়াছে। দেশেই লিথিয়াম উপলব্ধ হইবার কারণে আর বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করিবার প্রয়োজন পড়িবে না। ব্যাটারি শিল্পে ভারত আত্মনির্ভর হইয়া যাইবে। জম্মু-কাশ্মীরেও বিশাল কর্মসংস্থানের দিক খুলিয়া যাইবে। এককথায় ভারতবাসীর ভাগ্য খুলিয়া যাইবে। ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মোদীর ভাগ্যেই ভারতবাসীর ভাগ্য খুলিয়া যাইতেছে। মোদীর জন্যই আজ ভারত বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। আজ মোদী শুধু ভারতের নেতা নহেন, তিনি বিশ্বনেতা। বিশ্বের ৭২ শতাংশ মানুষের নিকট মোদীর গ্রহণযোগ্যতা রহিয়াছে এবং তাহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিমধ্যেই ভারত জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সভাপতি মনোনীত হইয়াছে। মোদীর হাত ধরিয়াই দেশবাসী অচ্ছেদিনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর উদ্যমী পুরুষ মোদীর হাত ধরিয়াছেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী।

## সুভাষিতম্

*পরান্নং চ পরদ্রব্যং তথৈব চ প্রতিগ্রহম্।*

*পরস্ত্রীং পরনিন্দাং চ মনসাঽপি বিবর্জয়েৎ।।*

পরের অন্ন, পরের ধন, দান গ্রহণ, পরস্ত্রী গমন এবং পরনিন্দা — এসব মনে মনেও বর্জন করতে হয়।

# মমতা বধির সাজলেও ‘এই তৃণমূল আর না’ আওয়াজ এখন রাজ্যজুড়ে

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

আগেই লিখেছি তৃণমূলের এখন শেষের শুরু হয়েছে। তার প্রমাণ সাগরদিঘির উপনির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়। হিস্ট্রি রিপিটস। ইতিহাস ফিরে আসে। ২০১১-তে সিপিএমের বিদায়ের বীজ পোঁতা হয়েছিল তিন বছর আগের পঞ্চায়েত ভোটে। তারপর ২০০৯-এ পশ্চিম বিষ্ণুপুরে উপনির্বাচনে সিপিএম হেরে যায়। সিপিমের তাত্ত্বিক মন্ত্রী অশোক মিত্র লিখেছিলেন তাঁদের সরে যাওয়ার সময় এসেছে সেটা মেনে নেওয়াই ভালো। তৃণমূলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে চলেছে। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটেই হয়তো তৃণমূলের বিদায় বাঁশী বাজবে। ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড আর মেঘালয়ের ভোট প্রমাণ করেছে তৃণমূল কেবল ‘পশ্চিমবঙ্গের দল’। আর মমতা জাতীয় রাজনীতিতে বেমানান।

পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের বিপর্যয় যে অবশ্যম্ভাবী অনেক তৃণমূল নেতাও তা মানতে শুরু করেছেন। এই অগ্নিপরীক্ষা মমতা সহজে উতরাতে পারবেন বলে মনে হয় না। পারলে আমি মেনে নেব তাঁর ম্যাজিক আছে। হয়তো রাজ্যের মানুষ জেদের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে তৃণমূল শাসনের অবসান চাইছেন। সাগরদিঘি তার উদাহরণ। মমতার শাসন অপশাসনে পরিণত হয়েছে কিনা তার বড়ো প্রমাণ ভোটবাক্স। তবে মমতার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের কিছুটা দ্বিধা আছে। এই ক্ষোভ উগরে দিতে আলাদা কোনো জোট লাগবে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তাই যেকোনো ছল বা কৌশল করে তৃণমূলকে হারাতে চাইছে। মমতার ভাষায় এই জোট আসলে নীতিহীন ‘ঘোঁট’। পাপের ঘরের বৃদ্ধি আটকাতে কোনো কৌশল অন্যায় নয়। তাই সাগরদিঘি উপনির্বাচনে চিরশত্রু কংগ্রেস আর সিপিএমের মিলন ঘটেছে। মমতা-বিরোধী লড়াইয়ে তা উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে ২৮ শতাংশ আর তৃণমূলের ভোট কমেছে ১৫ শতাংশ। বিজেপির ভোট কমেছে ১১ শতাংশ। বিজেপির ভোট নিজের ঘরে থাকলে তৃণমূল চতুর্থবারের জন্য জয়লাভ করত।

মুসলমান অধ্যুষিত সাগরদিঘির ভোট সমীকরণ মমতার কপালে ভাঁজ ফেলেছে। সাগরদিঘি নিয়ে গাছাড়া ছিলেন মমতা। তাঁর দলের লোকেরা হয়তো তাঁকে বুঝিয়েছিল যে তিনবারের জেতা আসনে হেরে যাওয়া অসম্ভব। আর তা যখন নিবিড় ভাবে সংখ্যালঘু। দান উলটে যাওয়ায় মমতা দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। সাগরদিঘির হারের কোপ হয়তো পড়বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর ফিরহাদ হাকিমের ঘাড়ে। এটা দেখার, মমতা কার প্রতি স্নেহপরবশ হন। দল না

**মমতার মধ্যে আমি ইন্দিরা গান্ধীর ছায়া দেখতে পাই। ভুল করলে তা স্বীকার করেন না। ইন্দিরা গান্ধী ডুবেছিলেন জরুরি অবস্থার ভুল স্বীকার না করে। আর মমতা ডুবতে চলেছেন দুর্নীতির সমুদ্রে।**

পরিবার। দলীয় মহলে ফিরহাদ (ববি) হাকিম আর অভিষেকের অহি-নকুল সম্পর্ক। তৃণমূল মুসলমান ভোটনির্ভর দল। তাদের তুষ্টিকরণ তৃণমূলের বুনিয়াদ। রাজ্যের ১২৮টি মুসলমান আর ৬৭টি আরও নিবিড় আসন তৃণমূলের পাখির চোখ। তার মধ্যে রয়েছে বেহাত হয়ে যাওয়া সাগরদিঘি আসন।

তুষ্টিকরণের পায়রার খোপে কালো বিড়ালের আচমকা হানা মমতার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সহ্য করতে না পেরে মমতা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে ব্যক্তিগত আর বেহিসেবি আক্রমণ করে ফেলেছেন। সাধারণভাবে মমতা তা করেন না। সিমিএমের জমানায় তাই ঘটেছিল। মমতাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেন সিপিএমের নেতারা। সকলেই হেরে যান। ‘এই তৃণমূল আর না’ বলে যিনি গান বেঁধেছিলেন বিজেপির সেই প্রাক্তন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এখন তৃণমূলের বিধায়ক। শুনেছি অস্বস্তিতে রয়েছেন। বিজেপি ছেড়ে এসে কোনো ফয়দা হয়নি। তাঁর রাজনৈতিক গুরুও বেকায়দায় রয়েছেন। শিরে সংক্রান্তি। তার কাছের মানুষদের ঘিরে ফেলে তদন্তকারীরা বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি নাগালের বাইরে নন। পঞ্চায়েত ভোটের আগেই তিনি মালুম পাবেন। পিঠ বাঁচানো যাবে না। মূর্খের মতো সিপিএম ভাবত তারা হারবে না। চিরকাল শাসক হয়ে থেকে যাবে। মমতাও সেই ভুল করছেন। মমতার মধ্যে আমি ইন্দিরা গান্ধীর ছায়া দেখতে পাই। ভুল করলে তা স্বীকার করেন না। ইন্দিরা গান্ধী ডুবেছিলেন জরুরি অবস্থার ভুল স্বীকার না করে। আর মমতা ডুবতে চলেছেন দুর্নীতির সমুদ্রে। কিন্তু মানবেন না। ‘এই তৃণমূল আর না’ গানকে মমতাই প্রাসঙ্গিক করে তুলছেন। □

# কালো রঙের দোল

নানারঙেষু দিদি,

কেমন লাগল সম্বোধনটা? আসাপনার কথায় আমি অনেক রং খুঁজে পাই। বসন্তের এই চিঠিতে তাই সাহস করে কথাটা লিখেই ফেললাম। আপনার বন্ধু বানানো থেকে শত্রু বানানো সবেতেই কত রং। আপনার কবিতা, আপনার ছবির রঙের কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু দিদি, আজ এই বসন্তে মন খারাপ নিয়ে চিঠি লিখছি। আসলে মনে কালো রঙের বিষাদ। কেমন যেন মনে হচ্ছে, আপনি যেটাকে বিশ্ববাংলা বলেন সেটা আসলে নিঃস্ব বাংলা। কী প্রাচীন সংস্কৃতি এই বাংলার। কত গর্ব, কত গান, কত কবিতা, কত ঐতিহ্য। কিন্তু আজ বাংলা মানে 'অর্থ উদ্ধার', বাংলা মানে 'চাকরি বিক্রি'।

না দিদি, আমি আপনাকে আক্রমণ করছি না। আজ শুধু কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছি। আজ শিক্ষার গর্ব প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে দিচ্ছে প্রেসিডেন্সি জেল। বাংলা আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব সেটা তো আপনি নিজেই বলেন। বারবার বলেন, সরকারের হাতে টাকা নেই। ডিএ দিতে পারা যাবে না। সরকারের হাতে টাকা নেই, তাই কেউ ন্যায্য পাওনা চেয়ে 'ঘেউ ঘেউ করবেন না। আদালত কান মুলে দেওয়ার পরেও বলতে হয় ডিএ কারও অধিকার নয়। গোটা দেশে যখন রঙের উৎসব তখন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের কাছে দোল কালো রঙের। ঠিক আমার মনের মতোই।

শিল্পের কথা আজ তোলা থাক। বাঙ্গালির ব্যবসা নিয়ে একটু বলি। ১৮৯২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে গড়ে ওঠে বেঙ্গল কেমিক্যালস। তবে বাংলায় শিল্প আন্দোলনের জোয়ার আসে স্বদেশি আন্দোলনের হাত ধরে (১৯০২-১৯০৭), ডন সোসাইটির শিল্প বিভাগের উদ্যোগে। অনেক ছোটো-বড়ো কারখানা, যেমন, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মোহিনী কটন মিল গড়ে ওঠে। ডাক্তার নীলরতন

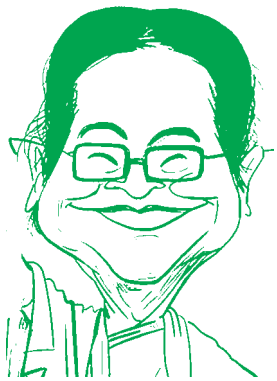

**অর্পিতা মুখোপাধ্যায় বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর হয়ে উঠেছেন। সবাই ওটা দেখিয়ে বাংলাকে চিনছেন। টাকার পাহাড় কিন্তু বাংলার ছবি নয়। সত্যিই আমাদের বসন্তে দোলের রং কালো।**

সরকারের উদ্যোগে ট্যানারি কারখানা। অনেক জায়গায় হোসিয়ারি শিল্প, তাঁতের শাড়ির বড়ো বাজার ছিল বাংলায়। সুতরাং বাঙ্গালিরা শিল্পে বিমুখ, একথা ঠিক নয়। রাজনীতি গিলে নিয়েছে সব। বইপাড়াতেও বাঙ্গালি কমেছে। টিকে আছে কিছুটা বিড়ির ব্যবসায়ী আর পাচার। কী বলবেন দিদি? বাংলার দোল কালো রঙের নয়?

বাঙ্গালির নিজস্বতা ছিল বারোয়ারি সংস্কৃতি। দোলেও আমরা চাঁদা তুলে ন্যাড়াপোড়া করতাম। কিন্তু এখন? পুজো কমিটিগুলোকে টাকা দিয়ে কিনতে গিয়ে সেই সংস্কৃতি তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন করের টাকায় পুজো হয়। চিরটাকাল আমরা পাড়ায় কারও মৃত্যু হলে সবাই মিলে দাহকাজে হাত লাগিয়ে এসেছি। এখন তার জন্যও সরকারি প্রকল্প। ভোটার কিনতে গিয়ে আপনি প্রমাণ করেছেন, মা-বাবাকে দাহ করার মতো টাকাও এখন এরাজ্যের সন্তানের কাছে থাকে না। দোলের রং কি কালো নয়?

ভোট কেনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালাতে গিয়ে সরকারের ভাণ্ডার এতটাই খালি যে কলকাতা পুরসভার কোটি কোটি টাকা মেটাতে পারছে না নবান্ন। তবু আমি বলব, আর্থিকভাবে নিঃস্ব হলেও হারতে হয় না। আর বাঙ্গালি অর্থ নয়, চিরকাল মেধাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কিন্তু আজ এরাজ্যে যাঁদের নাম রোজ খবরে শোনা যায়, তাঁরা অর্থে বলীয়ান; মেধায় নন। মানতে না চাইলেও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর হয়ে উঠেছেন। সবাই ওটা দেখিয়ে বাংলাকে চিনছেন। টাকার পাহাড় কিন্তু বাংলার ছবি নয়। সত্যিই আমাদের বসন্তে দোলের রং কালো। □

অতিথি কলম

রাজেশ শুক্লা

# ভারত তার চিরকালীন বৈভব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে

**নিম্ন আয়ের মানুষজনের পরিবারে প্রাধান্য দেওয়া হয় একান্ত প্রায়েজনীয় বস্তুগুলির ওপর। কিন্তু তাদের আয়ে বৃদ্ধি শুরু হলেই জিনিসপত্র, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ ক্ষেত্রে টাকা জমানোর বিষয়গুলি উঠে আসে। আমাদের এই অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ক্রয়ক্ষমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য নজরে এসেছে।**

দৈনন্দিন খরচখরচায় ভাটা পড়া করোনা-উত্তর অর্থনীতিতে একটি সাময়িক সঙ্কোচন। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থা এখনোও সমানভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কিন্তু খরচের বহর শিগ্‌গিরই অতি দ্রুত বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্তশ্রেণীর মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে।

ভারতে ভোগ্যপণ্য বিক্রির খামতি নিয়ে উদ্বেগ নিশ্চিত কিছুটা অতিরঞ্জিত। হ্যাঁ, এটা ঠিকই, সমাজের ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকলের মধ্যে খরচের রেখাচিত্রটি সরল নয়। আমরা কতকগুলি পরিসংখ্যানের ওপর নজর দেব যার মধ্যে গালগল্প নেই। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের জিডিপি'র যে আগাম হিসেব অনুযায়ী Private Final Consumption Expenditure (PFCE) বাস্তবে যা বাড়ির ঘরোয়া খরচ সেটির বিগত বছরের ১৪৩ এবং ২০২১ সালের ১২১ ট্রিলিয়ন থেকে এবছর ১৬৪-তে পৌঁছনোর কথা। আর জিডিপি-র যে ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি বাস্তব হতে চলেছে তা অনুমান অনুযায়ী সঠিক।

বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেশ খানিকটা আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু নামি প্রতিষ্ঠান PRICE ICE-এর সমীক্ষা অনুযায়ী (২০১৬, ২০২১, ২০২৩) বৃদ্ধি উল্লেখিত দুটি শ্রেণী পার করে নীচের দিকে অর্থাৎ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর দিকে নামা শুরু করেছে। প্রমাণস্বরূপ বলা হয়েছে, নীচের অর্থনৈতিক বন্ধনীতে থাকা মানুষের করোনা-পূর্ব সময়ে বাড়তি খরচ করার ৬.৫ শতাংশ টাকা করোনার সময় নেমেছিল ৩ শতাংশে, আর ঠিক এখন ৪.৫ শতাংশ চলছে এবং নিত্য বেড়ে চলেছে।

এর অর্থ এটাই যে, সমাজের ৪০ শতাংশ এইসব মানুষ এখনও পুনরুজ্জীবন (Recovery) পর্বে রয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ক্ষমতা বৃদ্ধি পর্ব। এর অর্থ তারা তাদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটাচ্ছে, একই সঙ্গে এই সংক্রান্ত দেনাও (বাড়ি কেনার ধার, ফ্রিজ কেনার কিস্তি) মিটিয়ে দিচ্ছে, যার মধ্যে অনেক কিছুই মহামারীর সময় থেকে চলে এলেও বাধা পড়েছিল। এই জন্যই চলতি যে উত্থান হচ্ছে তা সমাজের সমস্ত অংশব্যাপী সমভাবে নয়। আরও খানিটা সময় লাগবে দেনার দায়কে একটু নিয়ন্ত্রণ করে নিম্নবিত্ত সমাজকে নতুন ভোগ্যপণ্যের দিকে হাত বাড়াতে।

সামনে সুসংবাদ ঃ আমাদের এখানে নজরে আনা দরকার যে, ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি কিন্তু তুলনামূলকভাবে দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। একথা বিশেষ করে সত্যি অন্য ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলে। আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভবিষ্যতে দিন আরও উজ্জ্বল। জিডিপি বৃদ্ধি ৬ থেকে ৭-এর মধ্যে থাকার ফলে তার অংশ ৬০ শতাংশ হবে গৃহস্থালী সংক্রান্ত খরচ এবং একান্তই নাগরিকদের ব্যক্তিগত। এটা অর্থনীতির চালিকাশক্তি হয়ে ওঠার ক্ষমতা ধরে। অন্যদিকে, ২০২১-২২-এর তথ্য অনুযায়ী খরচ উপযোগী টাকা থেকে ২১ শতাংশ সঞ্চয় করার প্রবণতা অর্থনৈতিকভাবে স্বাস্থ্যকর। এর মধ্যে কর্মক্ষম জনসংখ্যার গড় বয়সটি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক, সেটি ৩০ বছর।

জিডিপি-র বৃদ্ধি যত বাড়বে তার অর্থ দাঁড়াবে জনগণের মধ্যে ভোগ্যবস্তু কেনার পরিমাণ বেড়ে চলেছে। আর জিডিপি বৃদ্ধি মানেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে খরচ উপযোগী অর্থভাণ্ডার স্ফীত হচ্ছে। যেমন এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে (২০২০-২১ সালে খরচ উপযোগী আয় ৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ ছিল এমন মধ্যবিত্ত সংখ্যা থাকলে) ২০৩০ সালের মধ্যে ১৬৫ মিলিয়ন পরিবার বা ৭১৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৭১ কোটি পাঁচ লক্ষ উপভোক্তা (যারা খরচ করছে) মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খরচের পরিমাণ বর্তমানের ৪৮ শতাংশ থেকে এই দশকের শেষে ৭০ শতাংশে পৌঁছবে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে যে

১১.৫ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে আসবে। দরিদ্রের শতাংশ আজকের ১৪ থেকে ৫-এ নেমে আসতে চলেছে।

কে কী ভোগ্যবস্তু কেনে ঃ সাম্প্রতিক সময়ে মাঝারি মাপের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, উচ্চহারের মুদ্রাস্ফীতি ও উপভোক্তার চাহিদা — এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এই নিয়ে আমাদের সর্বশেষ সমীক্ষা The rise of India"s midde class-এ দেখানো হয়েছে খাদ্য। এর মধ্যে সপরিবারে হোটেলে গিয়ে খাওয়া এখনো পর্যন্ত খরচের সিংহভাগ ৫১ শতাংশ মধ্যবিত্তের তহবিল থেকে যায়(সমগ্র খরচের)। কিন্তু এই খরচ নিম্নগামী হলেও এর স্থলে আরও গঠনমূলক খরচ— বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনা, ঘরগৃহস্থালীর সংস্কারের পেছনে ১২ শতাংশ, স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চায় ৮ এবং ভ্রমণের ক্ষেত্রে খরচ ৬ শতাংশ বেড়েছে।

গ্রামীণ অঞ্চলে অর্থনৈতিক ধাপের শেষ ১০ শতাংশে থাকা পরিবারগুলি সামগ্রিক খরচের ৫৬ শতাংশ খাদ্যবস্তুর পেছনে খরচ করে। অন্যদিকে, ওপরের ধাপে থাকাদের ১০ শতাংশ তাদের খরচের ৩২ শতাংশ খাদ্য-পানীয়ে ব্যবহার করে। একইভাবে শহরাঞ্চলে নীচের দিকে থাকা ১০ শতাংশ মানুষের পরিবার তাদের মোট আয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ খাদ্য সংগ্রহে নিঃশেষ করে ফেলে। কিন্তু ওপরের ১০ শতাংশ প্রাচুর্যের সম্প্রদায় খাওয়ার পেছনে মাত্র ২১ শতাংশ খরচ করে। এটি কিন্তু চলতি ধারণার সঙ্গে সবসময় খাপ খায় না।। তার অন্য বহুবিধ কারণ আছে।

কীভাবে ও কী ধরনের বস্তু ভোগ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার দ্বারা কী পরিবর্তন পরিবারে সাধিত হয়েছে, তা অর্থনৈতিক স্ট্যাটাস অনেকটাই চিহ্নিত করে। নিম্ন আয়ের মানুষজনের পরিবারে প্রাধান্য দেওয়া হয় একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির ওপর। কিন্তু তাদের আয়ে বৃদ্ধি শুরু হলেই জিনিসপত্র, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ ক্ষেত্রে টাকা জমানোর বিষয়গুলি উঠে আসে। আমাদের এই অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ক্রয়ক্ষমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য নজরে এসেছে।

এই সূত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং তাদের নীচের শ্রেণী যারা মধ্যবিত্ত অবস্থায় পৌঁছাতে উন্মুখ, এই উভয়ের মধ্যে কিন্তু খরচের চরিত্রের মধ্যে বড়োসড়ো ফারাক রয়েছে। আমরা যদি সারা ভারতের খরচের সূচককে ১০০ ধরি, সেক্ষেত্রে জামাকাপড়, জুতো এবং এই সংক্রান্ত জিনিসপত্র কেনার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত আসছে ২০০-তে আর মধ্যবিত্ত হতে চাওয়ারা আসছে মাত্র ৪৪ ক্রমাঙ্কে। মনোরঞ্জন, আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রে এই মাত্রা ১৮৯ — ৪৪, অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য সূচক ১৮৮—৪৩, ফল ও অন্যান্য আনাজপাতি ১৮৮—৪৬ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮৩—৮৩।

অন্য সাফল্যের গল্পের সঙ্গে ভারত আলাদা নয়। যে বড়ো বড়ো ফাঁক বা শূন্যতাগুলি উল্লেখ করলাম, তা থাকা সত্ত্বেও আমাদের ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটি ঘটে যখন পরিবারগুলি নিছক বেঁচে থাকার পর তার ইচ্ছাপূরণের বস্তুগুলি সংগ্রহের দিকে নজর দেয়। এটি ঘটা শুরু হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত পরিসংখ্যান ব্যবহার করে আমরা খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে ০.৪৭ সংখ্যা পেয়েছি, যার অন্য গৃহস্থের ইচ্ছাধীন বস্তু যেমন শিক্ষা ( গ্রামে ০.৭৯, শহরে ০.৬৭) ও পরিবহণ (গ্রামে ১.০৮, শহরে ০.৯৭)-এর চেয়ে কম। অর্থাৎ মানুষ কেবল বাঁচার উপকরণের প্রয়োজন কাটিয়ে উঠে এগোচ্ছে। আয়ের সঙ্কোচন ও ব্যবহারিক বৃদ্ধি (elasticity) সূচক দ্বারা পাওয়া যায় আর বৃদ্ধি পেলে কতটা খরচ বাড়ানো যায়। যেখানে খাদ্যের বাইরে যাবার সঙ্কেত আগের পরিসংখ্যানগুলি দেখিয়েছে।

এই ঐতিহাসিক প্যাটার্ন পৃথিবীর অন্যান্য অর্থনীতিগুলি যারা দ্রুতগতিতে বেড়েছে সেখানে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটলেই আগে বলা বুনিয়াদি খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুতে খরচের সূচক কমে আসবে। বাড়তে থাকবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মনোরঞ্জন, ভ্রমণ— এই ক্ষেত্রগুলির সূচক। কেননা যারা এতদিন উন্নয়নের সুফল নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে থেকে পায়নি, এইবার তারা পাবে। বাড়তে থাকবে মধ্যবিত্তসুলভ দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যবস্তু কেনার ধারা।

তাই আমরা বলছি আজকের হিসেবেও ভোগ্যপণ্য ব্যবহার এবং ক্রয়ের ধারায় যে বৈষম্য রয়েছে, ভারত যতই উৎপাদন ও বণ্টনের প্রক্রিয়ায় বেড়ে উঠবে, বাড়বে শহরীকরণ, ডিজিটাইলাজেশন, ভীষণ গতিতে বেড়ে চলা পরিবহণ কর্ম-শ্রেণীবিভেদ ঘুচে ভারত নিশ্চিতভাবে একটি দ্রুতগতিময় ভোগ্যবস্তু ব্যবহারকারী (consumer ) অর্থনীতি হয়ে উঠবে।

***(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)***


## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

# ভাষাদিবসের মঞ্চ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যবহৃত

গত একুশে ফেব্রুয়ারি তথাকথিত ভাষাদিবসের দিন চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন বনাম আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাকবিতণ্ডার কথা সকলেরই জানা। শুভাপ্রসন্নর বক্তব্য ছিল বর্তমান বাংলাভাষা সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হচ্ছে। যেমন জল খাওয়ার পরিবর্তে পানি খাওয়া, নিমন্ত্রণ পাওয়ার পরিবর্তে দাওয়াত পাওয়া ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে বাংলাভাষায় সাম্প্রদায়িক দোষ ঘটছে। শুভাপ্রসন্নের এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মঞ্চে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী তো বটেই, তার তাঁবেদাররাও শুভাপ্রসন্নের সমালোচনায় মুখর হয়। দলীয় এক মুখপাত্র তো এমন ইঙ্গিতও করেন যে, ওই চিত্রশিল্পী নাকি জমি বা বিশেষ পদপ্রাপ্তি না ঘটাতেই এমন মন্তব্য করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীও ওই অনুষ্ঠানমঞ্চেই মেনে নেন, ওধার (পড়ুন বাংলাদেশ) থেকে চলে আসা শব্দগুলোর স্বীকৃতি দিতেই হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিশেষ করে বামপন্থীরা তো সরাসরি শুভাপ্রসন্নের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ আনে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু মানুষ পোস্ট করে জানান, যে বাংলা ভাষায় বহু আরবি-ফার্সি-উর্দুর সংমিশ্রণে বাংলা ভাষা নাকি সেকুলারিত্বের নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা যাক যে শুভাপ্রন্নের হয়ে ওকালতি করার কোনও দায় আমাদের নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গত কারণেই আমরা সহমত। এনিয়ে বিতর্কের পরেও শুভাপ্রসন্ন তাঁর বক্তব্যে অনড়। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক বাধ্যবাধকতার মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। সেই দায় তাঁর অন্তত নেই। এক্ষেত্রে স্পষ্টতই তাঁর ইঙ্গিত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি সংখ্যালঘু তোষণের দিকে। এই বিতর্কে আরও একটা বিষয় কিন্তু দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হলো। ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ইত্যাদি গালভরা নাম দিয়ে বাঙ্গালির ভাবপ্রবণতাকে যতই উসকে দেওয়ার চেষ্টা হোক, এই দিনের সঙ্গে বাঙ্গালির হৃদয়ের যোগ সামান্যই। বরং বাঙ্গালি 'বাঙ্গালি' হিসেবে অনেক বেশি গর্ব অনুভব করতে পারে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে ২১ সেপ্টেম্বর দিনটিকে স্মরণ করে। সেদিন তৃণমূল জমানায় ২০১৮ সালে বাংলাভাষার শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে দুই কিশোর ছাত্র পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।

এই চেষ্টা বহু বছর ধরে চলেছে যে ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালির আবেগকে উসকে দেওয়া হয়। একটা মেকি বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আবেগ তৈরির চেষ্টা হয় যাতে করে বাকি ভারতের সঙ্গে কখনই বাঙ্গালি একাত্ম হতে না পারে। বিষয়টা একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। এরাজ্যের জনপ্রিয় স্লোগান 'জয় বাংলা'। এমনকী রাজভবনে স্বয়ং রাজ্যপালের সামনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের শেষে এই স্লোগান দেওয়া হয়েছে। তথাগত রায় অনুষ্ঠানের শেষে এর প্রতিবাদ করেন। পরে বিষয়টির ব্যাখ্যা সঠিকভাবে দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''জয় বাংলা যদি পশ্চিমবঙ্গের জয়গান বোঝায় সেটা আমরা সকলেই চাই। কিন্তু এই বিশেষ স্লোগান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রদত্ত হয় ও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই ঐতিহাসিক কারণেই ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের মাটিতে তার সাংবিধানিক প্রধানের সামনে এই স্লোগান প্রযোজ্য নয়।''

বাংলাদেশের তথাকথিত বাঙ্গালিদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের একাসনে বসানোর চেষ্টা ইদানীংকালে আগের চেয়ে অনেক জোরালো হয়েছে, যাতে বাঙ্গালি আবেগকে কাজে লাগিয়ে বাকি ভারতের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি করা যায়। এই প্রবণতা এক অর্থে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক ক্ষত তৈরি করে দিতে পারে।

**বাংলা ও বাঙ্গালির প্রকৃত ইতিহাসকে ভোলানোর জন্য বঙ্গাব্দের প্রবর্তক আকবর ইত্যাদি নানা আজগুবি তথ্যের অবতারণা হয়েছে।**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে আদতে ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতার সংঘাত, বাঙ্গালি আবেগকে সেখানে শুধুমাত্র ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল তা এতদিনে পরিষ্কার। বাংলাদেশে আজও হিন্দুরা অত্যাচারিত হন। নিয়ম করে পূজাপার্বণে হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা হয়। কিছুদিন আগেই বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওতে মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তা সকলেরই জানা। গত ফেব্রুয়ারি মাসের একেবারে শেষদিকে মুর্শিদাবাদের নির্মলচর সীমান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশে বাধা দিতে গেলে ভারতীয় জওয়ানদের ওপর নৃশংস হামলা চালানো হয়। গত একবছর আগে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায় যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সংগঠন 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' জানিয়েছে, স্রেফ সরকারি মতেই গত ৯ বছরে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর তিন হাজার ছয়শো উনআশিটি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

প্রকৃত সংখ্যা অবশ্যই আরও অনেক বেশি। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত অনুসারী বাংলা ভাষায় সংমিশ্রণ সঙ্গত কারণেই ঘটেছে। বাংলা ও বাঙ্গালির প্রকৃত ইতিহাসকে ভোলানোর জন্য বঙ্গাব্দের প্রবর্তক আকবর ইত্যাদি নানা আজগুবি তথ্যের অবতারণা হয়েছে। এই ধারাতেই পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত বাঙ্গালির ভাষা আবেগকে কাজে লাগিয়ে একদিকে মুসলমান তোষণের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে, অন্যদিকে অখণ্ড বঙ্গের সেন্টিমেন্ট তৈরির মাধ্যমে তথাকথিত বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের নামে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ফাটল তৈরির ষড়যন্ত্র চলছে।

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই অবিলম্বে এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীকেই। □

# নাগাল্যান্ড নির্বাচন এবং বিজেপির রসায়ন

**ড. রাজলক্ষ্মী বসু**

বিধানসভা নির্বাচন ২০২৩। সময় বসন্ত, সবাই জানি নাগাল্যান্ডে ভারতীয় জনতাপার্টি জোট সরকার গঠন হলো। পরিসংখ্যান সবাই জেনে গিয়েছেন। তাই তাতে পরে আসব। কিন্তু নাগাল্যান্ডে কী করে বিজেপির ধ্বজা বসন্ত বাতাসে উড়ছে! বিজেপি বিরোধীরা যে বলে এই দলটা শুধুমাত্র হিন্দুদের ভোটে টিকে আছে। তা নাগাল্যান্ড তো সংখ্যালঘু খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঙ্গরাজ্য। তবে কোন ম্যাজিকে এমন হলো। এই রাজ্যেরই নাগা ব্যাপিস্তা চার্চ কাউন্সিল একটা সময় বিজেপির তুলোধনা করে বলেছিল খ্রিস্টানিটিতে বিশ্বাস না করা বিজেপিকে একটাও ভোট নয়। এই রাজ্য বিজেপির কাছে প্রথম থেকেই এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। একটু পিছনে ফিরে গেলেই আজকের এই সাফল্যের রহস্য বোঝা যাবে। সালটা ছিল ২০১৩। এনপিএফ, যারা নাগা সেন্টিমেন্ট খেলে ভোট পেত এবং রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংগঠন ছিল, তাদের মধ্যে চিড় ধরে। নিইফু রিও-র যে সংগঠন খণ্ডাংশ তা এনপিএফ থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করে— এনডিপিপি (ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি)। বিচ্ছিন্ন ওই দলের সঙ্গে বিজেপি গাঁটছড়া বেঁধে সেবার একটা মাত্র আসন জয় করে।

কিন্তু তার পরের বিধানসভাতে (২০১৮) সেই গাঁটছড়া আরও মজবুত হলে সেই আগের এক এক লাফে বেড়ে হয়েছিল এক ডজন আসন! বিজেপির ভোট শেয়ার ছিল ১৫.৩ শতাংশ। যে বিজেপিকে বহিরাগত বলত নাগাদের রাজ্য সেই তারাই অনবরত রিওদের সমর্থক সহযোগিতা পেয়েই চলল। এই বিধানসভাতেও তার বিন্দুমাত্র নড়চড় হয়নি। কেউ ছিল না বিজেপির সঙ্গে, মিডিয়া তো ছিলই না। ঠিক আগের বিধানসভার প্রাক্কালে ইম্ফল প্রেস জার্নালের সম্পাদক প্রদীপ ফানজোবাম লিখছেন, 'Given the power balance, the NPF could not muster the courage to protest the BJP move, nor did NDPP insist on the BJP serving ties with the NPF... Till the last moment before the BJP took the decision, both the NPF and NDPP were profusely pledging allegiance to the BJP'— সম্পাদকের বাণী ফলেনি। গত বিধানসভাতে যখন এক ডজন আসন বহিরাগত বিজেপি পেল তখন এটাও উল্লেখ করার মতো লড়েছিল মাত্র ২০টি আসনে। এবং ওই সাফল্যের পর অর্গানাইজার প্রকাশ করেছিল 'Tag of Hindu Chauvanism would now be countered forcefully'— ধর্ম চর্চার ভিত্তিতে কোনো ভোটই বিজেপি ও রাজ্যে

**আমাদের রাজ্যে যখন নির্বাচনের সময় মদ মাংসের মোচ্ছব চলে এমনকী বুথ চত্বরেও, সেখানে নাগাল্যান্ডের মতো ওই দূরের এক রাজ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কম পক্ষে ৭ হাজার ৮৭৩টি মদের বোতল নষ্ট করেছে পুলিশ। তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায়, ভোট হলো, বিজেপি ১২টা আসন পেল না। তবুও এই ভোটের মতো এতো তাৎপর্যপূর্ণ হতো না।**

সেবারও পায়নি। এবারও না। যেটা পেয়েছে তাকে বলে দর্শন বোধের ভোট। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ হয়ে দেওয়া ভোট। দর্শনগত যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য বিজেপি আঞ্চলিক চাকমা অটোনমাস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। জনজাতিদের আবেগ যেন গভীর ভাবে বীক্ষণ করা যায়; তাই।

২০২৩-এ রাজ্য ভোটে নাগাল্যান্ডে ভোটের হার ছিল ৮২ শতাংশের বেশি। ৬০ আসনের লড়াইতে বিজেপি প্রথম থেকেই ১ আসনে জিতে ছিল কারণ আকুলুটো কেন্দ্র ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। এবারেও ওখনে বিজেপির ঝুলিতে এক ডজন জয়। বিজেপিকে সমর্থন করা এনডিপিপি ২৫টি আসনের মালিক। উত্তর পূর্ব ভারতের দূর এই রাজ্যের এবারের ভোটটা শুরু থেকেই একটু ভিন্ন ছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারি যেখানে নির্বাচনের দিন নির্ণয় হয়ে গেছে, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় যখন ৭ ফেব্রুয়ারি, অবাক ঘটনা ৬ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ৬ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন। যখন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন চলছে তখন সংসদ হয়েছিল, নাগাল্যান্ডের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অভিজিৎ সিনহা জানিয়েছিলেন যখন সারা দেশে ১০ ঘণ্টা সময় ব্যাপী ভোট গ্রহণ চলে তখন ওই রাজ্যে তা ৯ ঘণ্টা। ওদের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সবার আগে যে, তাই। সেই লোকসভাতেও নাগাল্যান্ড বিজেপির প্রতি আস্থা হারায়নি। সদ্য হওয়া নাগাল্যান্ড রাজ্য নির্বাচনে কংগ্রেসের অবস্থান একটু পর্যালোচনা করা যাক। যে দল একটা সময় এই রাজ্যকে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে দিনের পর দিন অবহেলা দিয়েছে, তারা যোগ্য উত্তর ব্যালটেই পাচ্ছে।

নাগাল্যান্ড প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং সাংসদ ভিনসেনট এইচ পালা কার্যত বলেই ফেললেন যে তারা আর বৃদ্ধদের নিয়ে বিদ্ধ

হতে চান না। তাই নাগাল্যান্ডের ৬০ আসনের ৪৭টিতেই যারা কংগ্রেসের টিকিটে লড়েছেন তাদের সবাই অনূর্ধ্ব ৪৫। তারা সবাই মেধাবী ও পেশাদারি স্বভাবের। কিন্তু নাগাল্যান্ডের মানুষ তো মাথা চুলকেই চলেছেন— কাকে ভোট দেবে। গ্রামীণ অঞ্চলে প্রার্থীদের টিকিটি নেই। এর মধ্যে দক্ষিণ গারোর জনৈক কংগ্রেস নেতা দুম করে বললেন, কেন যে তৃণমূলের সঙ্গেও জোট করছে না কংগ্রেস! কারণ পার্শ্ববর্তী মেঘালয়েও কংগ্রেস বিগত ২৮ বছর ধরে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে হাত ধরে এসেছে। এই নাগাল্যান্ডেই ২০১৫-তে এক রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ পালাবদল হয়েছিল। ওই বছর কংগ্রেসের ৮ জন বিধায়ক এনপিএফ জয়েন করে।

উল্লেখ্য, তখন এনপিএফ আবার বিজেপির ভক্ত। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় বাহিনীর তখন অসম্ভব অসন্তুষ্টি প্রদেশের প্রতি। ২০১৮-র রাজ্য নির্বাচনে কংগ্রেস তো প্রার্থী বাছাই করতেই নাকানি চোবানি খায়। অবশেষে ১৮টি আসনের মধ্যে ১৫টিতে জমানত বাজেয়াপ্ত হলে খানিক ক্ষান্ত হয়। এবারের কংগ্রেস ২৫টি আসনে লড়তে চাইলেও, শেষের মাথায় এসে দু'জন প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। তার মধ্যে একটা আসন পূর্বে উল্লিখিত আকুলুটো। যেখানে বিজেপির কাজহেটো কিমিনি ড্যাং ড্যাং করে ফাঁকা মাঠে গোল করেন। অথচ এই নির্বাচনের আগে কংগ্রেস তো কম ভালো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। যেমন, ৩৩ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষণ (গ্রামীণ), মাসিক ৩০০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা, MGNREGA-তে ১০০ শতাংশ বেতন প্রাপ্তি, বিনা সুদে উচ্চ শিক্ষার হেতু ঋণ প্রদান, আরও আরও এবং আরও। পবন খের যখন এই নির্বাচনী ইস্তেহার হাতে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন তখনও দোষারোপ করছেন রিও কে। এই তো কংগ্রেসের মহা দোষ। লোকাল সেন্টিমেন্ট না বুঝে নিজেদের সাফাই গাওয়া। যা 'কংগ্রেস মুক্ত' নাগাল্যান্ড গড়ে তুলেছে।

কখনো একথা বলা যাবে না নাগ্যাল্যান্ডের মানুষ সব পেয়েছে। নাগাল্যান্ডের সবচাইতে বড়ো বিধানসভা কেন্দ্র গসপানি-১ নির্বাচনের প্রাক্কালে আরও উন্নত সড়ক যোগাযোগের জন্য সরব হয়। তারা পেয়েছে তাই আরও একটু উন্নত হওয়ার দাবি রাখে। যা অবশ্যই সঙ্গত। অসঙ্গত কংগ্রেসের জিজ্ঞাসা— যেমন সড়ক ব্যবস্থার কি উন্নতি করল বিজেপি? উত্তর এটাই যে নাগাল্যান্ড একদিন ভারতের সঙ্গেই থাকতে রাজি ছিল না তারা আজ ASEAN-এর প্রবেশ দ্বার হতে চলেছে। নভেম্বর ২০২২-এ যখন সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের যোগাযোগের জন্য পুনরায় ৬৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলো তখন নাগাল্যান্ডের জন্য অঙ্ক ছিল ৫ হাজার কোটি। গত বছর ডিসেম্বরে (৬ ডিসেম্বর) কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি ট্যুইটে জানান ডিমাপুর-কোহিমা ১৪.৯৩ কিলোমিটার ৪, লেন সড়ক প্রকল্পটি সম্পন্ন হলো যার ব্যয় ৩৮৭ কোটি টাকা। এবার যদি জিজ্ঞাসা করি কংগ্রেস কী করল? এই প্রকল্পের প্রস্তাবনা অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে ২০০৩-এ। লক্ষ্য ছিল ২০১৫-র মধ্যে যেন তা সম্পন্ন হয়। তারপর কেন্দ্রে রাজনৈতিক পালাবদল এবং কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার। পরের দশটা বছরে কি কংগ্রেসের নির্বাচন জয়ের হ্যাংওভার কাটেনি? তাই উক্ত প্রকল্পের ফাইল পুনরায় ২০১৪-তে বিজেপিকেই খুলতে হলে।

কেন্দ্রের উদ্দেশ্য কেবল রাস্তা নির্মাণই নয়, মানুষের অগ্রগতির স্বাচ্ছন্দ্যের সুগমতা গঠন। ২০১৬-তেই কেন্দ্র 'নাগাল্যান্ড ভিশন ২০৩০'-এর উল্লেখ করে। যা উন্নত সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে লংওয়া, পাংগসহাতে গড়ে ওঠা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। বিজেপিই পারবে ইনটেনসিভ অ্যান্ড ইনক্লুসিভ এগরিকালচার ক্লাসটর গঠন করে উন্নত নাগাল্যান্ড স্থাপন করতে। নাগাল্যান্ড নির্বাচন যথাসম্ভব সুষ্ঠু হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎপর নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনুমানিক ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মাদক, ৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা নগদ, ৪ কোটি ৬৫ লক্ষের সুরা, এছাড়াও ৪ কোটি ৩৭ লক্ষের মূল্যবান সামগ্রী এবং ১৬ লক্ষের মূল্যবান ধাতু বাজেয়াপ্ত করে। নির্বাচনী আচরণ বিধি যথেষ্ট কড়া ভাবে পালন হয়েছে। আমাদের রাজ্যে যখন নির্বাচনের সময় মদ মাংসের মোচ্ছব চলে এমনকী বুথ চত্বরেও, সেখানে নাগাল্যান্ডের মতো ওই দূরের এক রাজ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কম পক্ষে ৭ হাজার ৮৭৩টি মদের বোতল নষ্ট করেছে পুলিশ। তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায়, ভোট হলো, বিজেপি ১২টা আসন পেল না। তবুও এই ভোটের মতো এতো তাৎপর্যপূর্ণ হতো না।

১৯৬৩-তে গঠন হওয়ার পর থেকে এই রাজ্য একটাও মহিলা বিধায়ক পায়নি। এই ভোট সেই উপহারটাও দিল। হেকানি জাখালু এবং সালহাউতুওনুও ক্রুস, প্রথম জন ডিমাপুর ৩ এবং অন্যজন পশ্চিম আঙ্গানি থেকে জয়ী। দুজনেই এনডিপিপি। এই রাজ্যের ৪৯.৭৯ শতাংশই মহিলা সেখানে এতোকাল একটাও মহিলা বিধায়ক নেই! এবার যে রেকর্ড তৈরি হলো তার পরের পাতাটাও ধীরে ধীরে এডিট করতে হবে যে, পাতার পরিসংখ্যান বলছে এবার ১৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৪ জন মহিলার নাম। আতোইজু কেন্দ্র থেকে বিজেপির মহিলা মুখ ছিলেন কাহুলি সেমা এবং টেনিং আসনে ছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে রোজি থমসন। বিজেপির মহিলা প্রার্থীর একটা বিশেষ দিক তিনি সুমি সম্প্রদায়ের প্রথম এবং নাগাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহিলা যিনি রাজ্যের পূর্ত বিভাগের একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। এই প্রথম নাগাল্যান্ডের ভোট যেখানে প্রথমবার লড়াই করল আম আদমি পার্টি, রাইজিং পিপলস পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া এবং রামবিলাস পাশোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি। জাতীয় এবং আঞ্চলিক মিলিয়ে মোট ১২--- সেই এক ডজন দল এবার নাগাল্যান্ডের ভোট ময়দানে। নাগাল্যান্ডে বিজেপির উত্থান এবং অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকা, সাফল্য এবং এবারের রাজ্য নির্বাচনে আরও একটু উর্বর মাটির যোগ ১২টা আসন— সব মিলিয়ে কংগ্রেসের ১২টা বাজিয়েছে। মানুষের মুণ্ড কাটার প্রাচীন রেওয়াজ (এখন অবলুপ্ত) আরও অনেককিছু নিয়ে এক রহস্যময় মাটি। বিজেপি ও নাগাল্যান্ডও এক রসায়ন রহস্য। □

# ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বনেতা মোদী

**মণীন্দ্রনাথ সাহা**

পাকিস্তানের জনগণ আওয়াজ তুলেছেন 'পাকিস্তানে মোদীকে প্রধানমন্ত্রী চাই।' 'পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক।' 'অখণ্ড ভারতই ভালো ছিল।' 'আমরা চাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।' 'মোদীকে আমাদের দাও'— বলে তারা কাতর আর্জি জানাচ্ছে। তাদের আরও দাবি— 'আল্লা, মোদীকে আমাদের দাও, এই দেশটা উনি ঠিক করে দিন।'

এই কথাগুলো কোনো ভারতীয়ের ব্যঙ্গ করে বলা নয় বা বিশ্বের অন্য কোনো দেশের মানুষের নয়। একথা ভারতের চিরশত্রু দেশ পাকিস্তানের জনগণের। পাকিস্তানের মানুষের অবস্থা এখন না খেতে পেয়ে সঙ্গীন। যা প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে বিশ্ববাসী জানতে পারছেন। সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের বাজার দর এখন আকাশছোঁয়া। দৈনন্দিন খাবার উপকরণ আটার জন্য সেখানে কাড়াকাড়ি, ধস্তাধস্তি, মারামারি, এমনকী মৃত্যুও ঘটছে।

পাকিস্তান এরকম দেউলিয়া হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ হিসেবে অনেকেই মন্তব্য করছেন, পাকিস্তান সরকারের জঙ্গিপ্রীতি দায়ী। ভারতকে অস্থির করে রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার ঋণের টাকা দিয়ে আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের লালন পালন করাই হয়েছে তাদের কাল। সম্প্রতি পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে জঙ্গি ইস্যুতে পাকিস্তানকে যেভাবে বিঁধেছেন বিশিষ্ট কবি তথা বলিউডের গীতিকার জাভেদ আখতার, তা রীতিমতো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। লাহোরে অনুষ্ঠিত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ নামাঙ্কিত উৎসবে গিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে জাভেদ আখতার যেভাবে পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছেন, তাকে কেউ কেউ 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' বলছেন। জঙ্গিদের

মদত দেওয়া নিয়ে জাভেদ আখতার যা বলেছেন, ভারত সরকারও সেই কথা পাকিস্তানকে বারবার বলেছে এবং বিভিন্ন তথ্য সূত্রও পেশ করেছে। তবুও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পাক সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

আমন্ত্রিত জাভেদ আখতার পাকিস্তানে গিয়ে একটি প্রশ্নের সূত্রে যেভাবে বাস্তবকে তুলে ধরেছেন, তাকে করতালি দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাকিস্তানিরা। সেই অনুষ্ঠানের এক সঞ্চালকের প্রশ্ন ছিল— 'দেশে ফিরে গিয়ে তিনি কি এটাই বলবেন যে, পাকিস্তানিরা ভালো মানুষ, তারা সব সময় বোমা ছোড়েন না, মালা আর ভালোবাসা দিয়ে স্বাগতও জানায়?' জাভেদ জবাবে বলেন— 'পরস্পরকে দোষারোপ করে লাভ নেই। তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। তা ঠাণ্ডা করা উচিত উভয় পক্ষের। তবে আমি মুম্বাইয়ের বাসিন্দা হিসেবে জানি সেবার কেমন হামলা হয়েছিল। হামলাকারীরা তো নরওয়ে থেকে অসেনি, ইজিপ্ট থেকেও নয়। তাদের মাথারা আজও আপনাদের মুলুকে অবাধে ঘোরাফেরা করে। তাই ভারতীয়রা যদি এনিয়ে অভিযোগ করেন, তাহলে আপনাদের খারাপ লাগার কারণ নেই।'

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর দশজন পাকিস্তানি জঙ্গি করাচি থেকে একটি নৌকায় চেপে মুম্বাই ঢুকে নির্বিচারে কী ভয়ংকর হত্যালীলা চালিয়েছিল, তা গোটা বিশ্ব জানে। ১৮ জন নিরাপত্তা কর্মী-সহ মোট ১৬৬ জন নিহত হয়। সংঘর্ষে ৯ জন জঙ্গি খতম হয়েছে। ধৃত কাসভের পরবর্তীতে ফাঁসি হয়েছে। এই হামলা যারা চালিয়েছিল তারা এখনোও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা মদত দেওয়া ছাড়া কী বলা যেতে পারে?

শুধু মুম্বাই হামলা নয়, ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধ, সংসদ ভবনে হামলা, উরি, পাঠানকোটের সেনাছাউনিতে আক্রমণ, কাশ্মীরের পুলওয়ামায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কনভয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদত জোগানোর অভিযোগ আছে। তিনি আরও বলেছেন, 'ভারত সব সময় পাকিস্তান থেকে আসা কবি, শিল্পীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তাদের সাক্ষাৎকার

ভারতীয় টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়। কিন্তু ভারতীয় কবি, শিল্পীদের সাক্ষাৎকার পিটিভি-সহ পাকিস্তানের চ্যানেলগুলিতে দেখানো হয় না। মেহেদি হাসান, নুসরত ফতেহ আলি খানের মতো পাকিস্তানি শিল্পীরা ভারতে অনুষ্ঠান করতে এসে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন। কিন্তু আপনারা কখনো লতা মঙ্গেশকরকে আমন্ত্রণ জানাননি।' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে পাকিস্তানি দর্শকরা জাভেদকে সমর্থন করেছেন, তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা পবন খেরা মন্তব্য করেছেন—'মোদী তেরি কবর খুদেগি।' তাঁর সেই মন্তব্যের জবাবে মোদী বলেছেন—'দেশের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়া মানুষ দুঃখে ডুবে গিয়ে এখন বলছেন, মোদী তোমার কবর খোঁড়া হবে। কিন্তু দেশের মানুষ বলছেন, মোদী, তোমার পদ্ম ফুটবে।'

কংগ্রেসের এই মোদী বিরোধী মন্তব্য বিজেপিকে ভালো লাভ উঠাতে সাহায্য করবে। বহুদিন আগে সোনিয়া গান্ধী মোদীকে বলেছিলেন, 'মওত কা সওদাগর।' এই একটি উক্তির জন্য মোদী নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাস্ত করেছিলেন। বিজেপি শিবির মনে করে মোদীর বিরুদ্ধে যত ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে, ততই তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ থেকে প্রেরণা নিয়ে দেশসেবার ব্রত নিয়ে নরেন্দ্র মোদী শুধু দেশের জনগণের সেবাই করছেন না, করছেন বিশ্বের জনগণের সেবাও। তারই অঙ্গ হিসেবে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে দুর্গতগ্রস্থ মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের বিপদমুক্ত করার উদারতা দেখিয়ে মোদী সকলের নজর কেড়েছেন। ২০০০ সালে ভারতের শত্রু তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের জনগণের জন্য খাদ্য ও ওষুধপত্র দিয়ে ভারত যেভাবে সাহায্য করেছে তার জন্য তালিবান সরকার কৃতজ্ঞচিত্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছে এবং বলেছে—'যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন ভারতকে ভুলবো না।'

গত মাসে ভূমিকম্পের ফলে তুরস্কে যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা হয়েছে তাতে বিশ্বের মধ্যে সবার আগে ভারত সরকার সেদেশে উদ্ধারকারী দল এবং বিপুল পরিমাণ ওষুধপত্র ও ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে মানবতার নজির স্থাপন করেছে। 'অপারেশন দোস্ত' নামে সেই সাহায্যে ভারতীয় বিমানবাহিনী, নৌবহিনী, স্থলবাহিনী এবং ডাক্তার-নার্স মিলে দুর্গত তুরস্কবাসীকে যেভাবে বাঁচার পথ দেখিখয়েছে তাতে অভিভূত তুরস্ক সরকার, তুরস্কবাসী এবং বিশ্ববাসী।

অথচ তুরস্ক সরকার বরাবর পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বিরোধিতা করে এসেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় ছিল ভারতের ত্রাণসামগ্রী বহন করে তুরস্কে যাওয়ার সময় তুরস্কের বন্ধুদেশ পাকিস্তান তাদের দেশের আকাশসীমা ভারতীয় বিমানকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। এই হলো তুরস্কের প্রতি পাকিস্তানের বন্ধুপ্রীতি। ভারতের এহেন মানবতায় মুগ্ধ তুরস্ক সরকার এবং সেখানকার সাধারণ মানুষ অভিভূত ও কৃতজ্ঞ। ভারতীয় উদ্ধারকারী দল যখন দেশে ফিরে আসছিলেন তখন করতালি দিয়ে তাদের বিদায় অভিনন্দন জানান তুরস্কবাসী। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এখন তাঁর প্রকৃত বন্ধু হিসেবে পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতকে বেছে নিয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এক বছর অতিক্রম করল। সমগ্র বিশ্ব এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দু'ভাগে বিভক্ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট নিজেও যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে কিছু করে উঠতে পারেননি। এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কতকগুলো পদক্ষেপের জন্য সমগ্র বিশ্ব সন্তোষ প্রকাশ করেছে। নরেন্দ্র মোদী উভয় পক্ষকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলেছেন। রাশিয়া বরাবর ভারতের মিত্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও পুতিনকে নরেন্দ্র মোদী বলেছেন—'এটা যুদ্ধের সময় নয়, প্রগতির সময়।' ইতিমধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন—'পুতিন ইউক্রেনে পরমাণু হামলা করতে চেয়েছিল কিন্তু ভারতের পরামর্শে তা থেকে পুতিন সরে এসেছেন।' সমগ্র বিশ্ব এখন চাইছে ভারত যুদ্ধবন্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করুক।

বিশ্বে মোদীর জনপ্রিয়তা যত বাড়ছে, ভারতে বিরোধীরা তত হিংসেয় জ্বলছে। উপরন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোদীর ঘোষিত যুদ্ধ আঞ্চলিক দল-সহ প্রত্যেকটি দলের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। তিনি জনগণের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিরোধীদের কাছে তাঁকে আক্রমণ করা ছাড়া আর কোনও সদর্থক বিকল্প নীতি নেই।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ একটি সমীক্ষায় প্রমাণিত, ফের একবার বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মর্নিং কনসাল্ট নামের এক আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টে এই তথ্য সামনে এসেছে। ৭৮ শতাংশ অ্যাপ্রুভ্যাল পেয়ে বিশ্বের জনপ্রিয়তম রাষ্ট্রনেতা নির্বাচিত হয়েছেন মোদী। ওই সংস্থার সমীক্ষায় গত বছরের সেই স্থান ধরে রাখলেন মোদী।

মর্নিং কনসাল্টের পর দেশের মধ্যে ইনসাস নামে আর একটি বেসরকারি সংস্থা মোদীর জনপ্রিয়তার রেটিং নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৮-৩০ বছরের যুবকদের কাছে মোদীর জনপ্রিয়তা ৭০ শতাংশ, অন্যদিকে ৩০-৪৫ বছরের মানুষজনের কাছে ৬৫ শতাংশ। বর্তমানে সারা দেশে মোদীর অ্যাপ্রুভ্যাল রেটিং ৬৭ শতাংশ। এতেই বিরোধীরা হিংসেয় জ্বলছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বিরোধীদের বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য এবং প্রচার অভিযান বারবার খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেন্ট্রাল ভিস্তার ক্ষেত্রেও সুপ্রিমকোর্ট বলেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে জি-টোয়েন্টি, সাংহাই কমিশন প্রভৃতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত যেভাবে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে, অতীতে তা দেখা যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' মন্ত্র এখন সারা বিশ্ব গ্রহণ করছে।

২০১৪ সালের নির্বাচনী পরিণাম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লন্ডনের পত্রিকা 'সানডে গার্ডিয়ান' লিখেছিল, '১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা হস্তান্তর পরবর্তী সময় Colonial legacy-র ধারা অব্যাহত ছিল, কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনী ফলাফল সেই ধারাকে বর্জন করে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে মান্যতা দিল।' মোদী এই ধারাকেই আরও সুসংহত করার দিকে এগিয়েছেন এবং এগিয়ে চলেছেন। এটাই মোদীর জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। ▯

# সবার বিকাশে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট

**ড. অনিল কুমার ঘোষ**

বাজেট সমস্ত দেশের মানুষের কাছে একটা আশা-নিরাশার উপলব্ধি। শ্রেণী বিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে বাজেট নানা ধরনের অনুভূতি তৈরি করে। একটা দেশের সরকারকে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কথা ভেবেই পরিকল্পিত আয়-ব্যায়ের একটা খসড়া তৈরি করতে হয়, একেই আমরা বাজেট প্রস্তাব বলে জানি। সংসদে পেশ করার পর সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে তা একটা চূড়ান্ত রূপ পায় যা নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে পালন করার ব্যবস্থা করা হয়।

বাজেট পেশের আগের দিন পেশ করা হয় অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট যা থেকে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কতখানি উন্নত হয়েছে তার একটা চিত্র পাওয় যায়। এবারের বাজেটের আগে পেশ করা সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে জানা যয়— বিগত ৯ বছরে দারিদ্র্য কমেছে, বেকারত্ব কমেছে এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে অনেকখানি। তবে দেশের জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৬.৫ শতাংশই থাকবে যদি না বিশ্ব অর্থনীতিতে উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন আসে। আসলে বিগত ২/৩ বছর ধরে করোনা মহামারীর প্রভাবে প্রায় সব দেশের অর্থনীতি কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে আমাদের দেশের অর্থনীতি বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় এই মহামারিতেও অনেকখানি ভালো বলা যায়। যে কারণে ভারত বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে দশম স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে উন্নীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহামারীর সময়ে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশকেই এমনকী তথাকথিত উন্নত দেশগুলিকেও করোনা ভ্যাকসিন দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের নজির গড়েছে। বসুধৈব কুটুম্বকম্ যে ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরা তা রূপায়ণ করে দেখাল। সংবাদপত্র বাজেট সম্পর্কে নানা অভিমত ব্যক্ত করেছে, যেমন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস বলছে— প্রবৃদ্ধির উঠানামা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই, সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে— আর্থিক সমীক্ষা ভারতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির একটি সুসম্বদ্ধ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে।

শ্রেণী বিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় বাজেট সকলের কথাই মাথায় রাখে, তবে সকলকে সুখী করতে পারে এমন কথা বল যায় না। কেননা জনসাধারণকে সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ সরকারকে গ্রহণ করতে হয়— এটা ভুললে চলবে না। তবে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট অনেকের মধ্যেই সন্তোষ বিধান করবে বলে আশা করা যায়। বিভাগ অনুযায়ী কি ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে সে বিষয়েই আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি।

অমৃতকালের জন্য এবারের বাজেটে তিনটি দিশার কথা বলা হয়েছে— (১) যুব প্রজন্মের প্রতি বিশেষ অভিমুখ নিয়ে নাগরিকদের সুবিধা প্রদান, (২) প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, (৩) শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সমষ্টিগত অর্থনীতির পরিবেশ তৈরি করা। এজন্যে সাতটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে যাকে এক কথায় বলা হয়েছে সপ্তঋষি।

**কৃষি :** ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। মোট জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান স্বাধীনতা উত্তরকালে কমেছে অনেকখানি কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য এখনও কৃষির উপরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। তাই কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টা যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে— একথা বলাই যায়। এবারের বাজেটে কৃষি ও সমবায় ক্ষেত্রের বিকাশের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান বিমা যোজনার মাধ্যমে তাদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে, সবুজ প্রবৃদ্ধি

অনুসারে ভারতে কৃষি ব্যবস্থায় জৈব কৃষির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সবুজ প্রবৃদ্ধি কর্মসূচির লক্ষ্য হিসেবে পিএম প্রণাম (পিএম প্রোগ্রাম ফর রেস্টোরাশান, অ্যাওয়ারনেস, নারিশমেন্ট অ্যান্ড আমিলিওরেশান অফ মাদার আর্থ) কর্মসূচি কার্যকর করা হবে যার মাধ্যমে বিকল্প সার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হবে। পরিবেশবিদদের কথায়— বর্জ্য হলো সম্পদ। এবারের বাজেটে প্রস্তাব রয়েছে বর্জ্য থেকে সম্পদ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ৫০০টি প্ল্যান্ট গঠন করা হবে। এর জন্য গোবর্ধন গ্যালভানাইজিং অরগানিক বায়ো অ্যাগ্রো রিসোর্সেস ধন) প্রকল্পের সূচনা করা হবে যা চক্র অর্থনীতিকে উৎসাহিত করবে। কর্ণাটকের খরাপ্রবণ এলাকায় ক্ষুদ্র সেচ সুবিধার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ১০,০০০ বায়ো ইনপুট রিসোর্স কেন্দ্র স্থাপন করা হবে যার মাধ্যমে কৃষকরা স্বাভাবিক চাষে সুবিধা পাবে। 'শ্রী অন্ন' প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমে গ্লোবাল মিলেট হাব গঠনের কথা বলা হয়েছে।

**কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প :** ভারতবর্ষ চিরদিনই এমন কৃষিভিত্তিক দেশ ছিল না, বরং ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে গ্রামীণ শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল সেকথা রমেশচন্দ্র দত্ত বহুদিন আগেই প্রমাণ করে গেছেন। শিল্পায়ন ঘটার কথা ছিল ভারতের মাটিতে কিন্তু হয়েছিল ইংল্যান্ডে। ধীরে ধীরে ভারতের শিল্পকাঠামো ভাঙতে শুরু করে ইংরেজ আমলে। তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে একদিকে যেমন অর্থনীতি মজবুত হবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কেননা আমাদের দেশ হলো জনবহুল বা শ্রমবহুল। এবারের বাজেটে রাজ্যগুলিকে উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, 'ইউনিটি মলস' স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে এক জেলা, এক দ্রব্য এবং হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া থাকবে কেন্দ্রীয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র যার মাধ্যমে কোম্পানি আইনের মধ্যে প্রশাসনিক কাজে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্প যার সাহায্যে এ ধরনের শিল্প ক্ষেত্র সহজে ঋণ পেতে পারে। কোভিড সময়কালে ক্ষতিগ্রস্ত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে রিলিফ দেবার কথা বলা হয়েছিল। সার্বিকভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প (এমএসই) ক্ষেত্রে উৎপাদন, বিপণন এবং রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা সমূহ এই শিল্প ক্ষেত্রকে উন্নত হতে সাহায্য করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

**যুবশক্তির ব্যবহার :** আমাদের দেশের জনবিন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় কর্মশক্তিসম্পন্ন জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই যুবশক্তির সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার প্রয়োজন তা দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিবেশকে সুশৃঙ্খলভাবে উন্নত হতে সাহায্য করবে। এই যুবসমাজের জন্য এবারের বাজেটে যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বাজেটের অভিমুখ বর্ণনার সময়েই বলা হয়েছে। যুব সমাজের কর্মসংস্থান, নতুন উদ্যোগ উদ্ভাবন এবং প্রাযুক্তিক ক্ষেত্রে নানা প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের নব নব ক্ষেত্রে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। বাজেটে প্রস্তাবে বলা হয়েছে যুবশক্তির জন্য পিএমকেভিওয়াই ৪০ লক্ষ করা হবে। এর মধ্যে থাকবে নতুন বিষয়গুলি যেমন— কোডিং, এ-১, রোবোটিকস, থ্রিডি প্রিন্টিং প্রভৃতি। ৫-জি পরিষেবার জন্য ১০০টি ল্যাব স্থাপন করা হবে যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক সুযোগ এবং কর্মসংস্থান এর সুযোগ ট্যাপ করা যাবে। ল্যাবে তৈরি ডায়মন্ডের জন্য অনুদান দেবার কথা ভাবা হয়েছে যা আমদানি নির্ভরতা কমাবে এবং দেশীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাবে, আত্মনির্ভর ভারত গঠনে সহায়তা করবে।

**সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ :** সমাজের অন্ত্যোদয় শ্রেণীর উন্নতি বিধান যে জরুরি তা এবারের বাজেটের গুরুত্ব বিচারে বোঝা যায়। ৭৪০টি একলব্য আবাসিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আরও শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি রয়েছে প্রাচীন লিপির মধ্যে। তাই এই সমস্ত প্রাচীন লিপির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণে প্রাচীন লিপির ডিজিটাইজেশনের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে। জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কোভিড ভ্যাকসিন, উজ্জলা কার্যক্রমে এলপিজি গ্যাস সরবরাহ, স্বচ্ছ ভারত মিশনে বাড়িতে টয়লেট নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের সামাজিক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গ্রামীণ আবাসন নির্মাণের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহিলা সম্মান বচত পাত্র নামের একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের দুই বছরের জন্য ২ লক্ষ টাকা সঞ্চয়ের সুযোগ দেবার কথা বলা হয়েছে। ১৫৭টি নতুন নার্সিং কলেজ স্থাপিত হবে। ফার্মাসিউটিক্যালসের গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। রক্তাল্পতা এদেশের একটি অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্যসমস্যা, বিশেষত মায়েদের ক্ষেত্রে। তাই এর প্রতিবিধানকল্পে 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশান মিশন' উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে ৫০টি ক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হবে যেখানে দেশি বিদেশি পর্যটকদের জন্য সম্পূর্ণ প্যাকেজ তৈরি করা হবে। এমআইএসটিআই বা মিস্টি (ম্যানগ্রোভ ইনিসিয়েটিভ ফর সোরলাইন হ্যাবিট্যাটস অ্যান্ড ট্যাঞ্জিবিল ইনকামস) প্রকল্পের মাধ্যমে স্থিতিশীল বাস্তুতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র উপকূলে লবনাম্বু উদ্ভিদ রোপণ করে উপকূলীয় পরিবেশ সুরক্ষার ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে। দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ির পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে, জলাভূমি যাকে পরিবেশের কিডনি বলা হয় তার পরিবেশ-বান্ধব সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য 'অমৃত ধরোহর' প্রকল্প কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। বয়স্ক নাগরিকদের সঞ্চয় সীমা ১৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

**অন্যান্য :** আলোচনা করা হলো যত, বাকি রয়ে গেল তার চেয়েও বেশি। যেমন আয়কর কাঠামো পরিবর্তন পরিকাঠামো উন্নয়ন, মূলধনী ব্যয়ের ক্ষেত্র, বিদেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্র ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রের জনমুখী এবং উন্নয়নমুখী প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে যা সার্বিকভাবে অনেকের সুখের কারণ ঘটাবে এবং ভারতীয় অর্থনীতির সর্বাত্মক বিকাশ ঘটাবে বলে আশা করা যায়। □

# পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুদেরই স্বীকৃত কোনো দেশ নেই

**জহরলাল পাল**

হিন্দুধর্ম যে বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম, তা নিয়ে সারা বিশ্বের পণ্ডিতদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা তাঁদের লেখা প্রামাণ্য গ্রন্থে হিন্দুধর্মের প্রাচীনতার কথা উল্লেখ করেছেন। সূচনা লগ্নে 'সনাতন ধর্ম' নামেই হিন্দুধর্মের পরিচিতি ছিল। বলা যেতে পারে যে, হিন্দুধর্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মতাদর্শের পরম্পরা নিয়ে তার সৃষ্টি।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৫০০-র মধ্যের সময়টিকে বৈদিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ধর্ম, অর্থ, কর্ম ও মুক্তিতেই হিন্দুধর্মের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ভারতভূমিতে হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। তৎসঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রচার ও প্রসার থাকলেও এই ধর্মদুইটির সঙ্গে 'সনাতন ধর্মের' বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তিনটি ধর্মই সমান্তরাল সহঅবস্থানে জনমনে বিরাজিত ছিল।

ভারতভূমিতে বিভিন্ন সময়ে যেসব ধর্মের প্রবর্তন অথবা ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে কয়েকজন ধর্মগুরুর উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। জৈন ধর্ম : প্রবর্তক মহাবীর জৈন (খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭)।

২। বৌদ্ধ ধর্ম : প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ (খ্রীস্টপূর্ব ৫৬৩-৪৮৩)।

৩। শিখ ধর্ম : প্রবর্তক গুরু নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ)।

বহিরাগত রিলিজিয়ন ও মজহব হলো যথাক্রমে খ্রিস্টান ও ইসলাম। সনাতন হিন্দু ধর্মের সূচনালগ্ন নির্ধারণ করা বাস্তবিকই কঠিন। প্রাচীন মুনি-ঋষিদের কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে সনাতন ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য মানবের দলে বিস্তার লাভ করে। ভারতীয় ধর্মগুলি সূচনা লগ্ন থেকেই ভারতের মাটিতে লালিত-পালিত তথা পূজিত হয়ে আসছে। ভারতের মাটিতে ইসলামের প্রবেশ ঘটে মহম্মদ বিন কাসেমের আক্রমণের মাধ্যমে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে কাসেম ভারতে প্রবেশ করে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে। দুর্গ দখল, মন্দির ধ্বংস, ধনদৌলত লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণ-সহ নারী শিশুকে বন্ধক বানিয়ে নিজ দেশে নিয়ে যাওয়াই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য।

এছাড়াও বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা ছিল তার অন্যতম প্রধান কাজ। এর প্রায় ৩০০ বছর পর আর এক বহিরাগত গজনির মামুদ একই উদ্দেশ্যে ভারতে আসে। তবে এইসব আক্রমণকারীরা কার্যসিদ্ধির পর নিজ নিজ দেশে চলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মহম্মদ ঘোরি (১১৯২ খ্রি:), কুতুবুদ্দিন (১১৯৪ খ্রি:) স্থায়ীভাবে ভারতে এসে রাজ্য শাসন-সহ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করে। এই প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি আটশো বছর পর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের বিভাজন (১৯৪৭ খ্রি:)।

বিশ্বের বর্তমান (১.১.২০২৩) জনসংখ্যা প্রায় ৭৯৪.২৭ কোটি। তার মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১১৯.১৪ কোটি (১৫ শতাংশ) এবং মুসলমানের সংখ্যা ১৮৪.২৭ কোটি (২৩.২ শতাংশ)। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সংখ্যাধিক্যের জন্য শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই দুই জাতিগোষ্ঠীই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে ভারত (৯৬.৬৩ কোটি হিন্দু) ও নেপাল (২.৩৬ কোটি হিন্দু) ছাড়া পার্শ্ববর্তী প্রায় সব কয়টি দেশই সংখ্যার বিচারে মুসলমান প্রধান। মুসলমানরা এশিয়া ও আফ্রিকার ৫৭টি দেশে বৃহৎ আকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় দেশগুলি ইসলামি দেশ হিসেবে পরিচিত। 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন' নামক সংগঠনের ছত্রছায়ায় এই ৫৭টি দেশ রয়েছে। ভারত কখনও হিন্দুদের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ১৯৭৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করায় পর সেই সম্ভাবনা একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। রাজতন্ত্রের সময়কালে নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু রাজতন্ত্রের অবসানের পর ২০০৮ সালে দেশটিকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ভারত ও নেপাল ছাড়া আর একটি মাত্র দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখতে পাওয়া গেলেও ছোটো এই দেশটির জনসংখ্যাও নগণ্য। মরিসাস নামক দেশটির জনসংখ্যা ১১.২৮ লক্ষ যেখানে ৬.৩৬ লক্ষ (৫৬.৪ শতাংশ) হিন্দু। ইসলামের সিদ্ধান্তমতে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের অন্তর্ভুক্ত ৫৭টি দেশ 'দার-উল-ইসলাম' নামে পরিচিত যেখানে অন্য দেশগুলি 'দার-উল-হার্ব'-এর সংজ্ঞায় স্বীকৃত। মুঘল ও পাঠান শাসনকালে ভারতবর্ষ 'দার-উল-ইসলাম' নামেই মুসলমান জগতে পরিচিত ছিল।

> দেশ ভাগের সময়কালে দেশনেতারা ৯ কোটি মুসলমানের জন্য পৃথক দেশের প্রয়োজন অনুভব করলেও ২৫ কোটি হিন্দুর জন্য এরূপ কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি।

দেশ বিভাগের সময় অবিভক্ত ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি, যেখানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২৫ কোটি এবং মুসলমানের সংখ্যা ৯ কোটি, ১ কোটি অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী। দেশ ভাগের সেই সময়কালে দেশনেতারা ৯ কোটি মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশের প্রয়োজন অনুভব করলেও ২৫ কোটি হিন্দুর জন্য এরূপ কোনো প্রয়োজন অনুভব করেননি। বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৫। লক্ষাধিক মানুষ নিয়ে বিশ্বে একটি ক্ষুদ্রতম দেশও আছে। কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীনতম হিন্দুজাতির কোনো স্বীকৃত দেশ নেই। পৃথিবীতে শুধু হিন্দুই দেশহীন জাতি।

## মালদায় বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

# পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত কমলী সোরেনেরও স্থান হলো মেঝেতে

**তরুণ কুমার পণ্ডিত**

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় বড়ো বড়ো ঝাঁ চকচকে সরকারি হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। তাদের আবার গালভরা নামকরণ করা হয়েছে সুপার স্পেশ্যালিটি

হাসপাতাল। অথচ পরিষেবা তথৈবচ। বেড না পেয়ে রোগীদের মাটিতেই থাকতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকার পর দেখা মেলে ডাক্তারের। দক্ষ নার্সের অভাবে চিকিৎসা পরিষেবায় ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রেই। এইসব মেডিক্যাল কলেজগুলিতে গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র মুমূর্ষু রোগীরা সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে দিনের পর দিন অবহেলিত থেকে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার থেকে বঞ্চিত হয়ে সাধারণ মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা যান। শুধু তাই নয়, নিকট অতীতে দেখা গেছে পিছিয়ে পড়া জনজাতি সমাজের কয়েকজন সম্মাননীয় ব্যক্তিকেও চিকিৎসা ব্যবস্থার এই অবহেলার শিকার হতে হয়েছে। সম্প্রতি মালদা জেলার পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত গুরুমা কমলী সোরেন অসুস্থ হয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হলে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ মেঝেতে বিছানা পেতে রেখে দেওয়া হয়। বিষয়টা নিয়ে হইচই শুরু হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে এবং তাঁকে কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়।

এমনিতেই হাসপাতালগুলোতে ডাক্তার ও নার্সের অভাব রয়েছে। তার ওপর দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবের ফলে চিকিৎসার গুণগত মান তলানিতে ঠেকেছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রয়োজন পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর, যাঁরা মানুষের পাশে থেকে যথাযথ চিকিৎসা পাওয়ায় ব্যবস্থা করবেন। এখন এই কাজগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের। কিন্তু তাও কোনো পরিকল্পিত ব্যবস্থা নয়, কাজ চালানোর একটা চেষ্টা মাত্র। তাঁরা শিশু ও গর্ভবতী মায়ের খোঁজখবর নিতেই ব্যস্ত থাকেন। তারপরও অতিরিক্ত কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপানো কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভাববার সময় এসেছে। আজ যেকোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণ ভারতে ছুটে যেতে হচ্ছে কেন?

তবে কি আমাদের রাজ্যে রাজ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে শুধুই সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য? অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতাল এবং ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা নার্সিংহোমগুলিতে কিছুটা সুব্যবস্থা মিললেও তা সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। মালদা-সহ অন্যান্য শহরগুলোতে নার্সিংহোমগুলি থেকেএজেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া থাকে। তারা ঘুরপথে রোগীদের নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়। এই এজেন্টরা যেমন সরকারি হাসপাতালে ঘুরে বেড়ায় তেমনি অটো, টোটো ও রিকশাচালকেরও ভালো চিকিৎসার নাম করে সেই সব নার্সিংহোমে মুমূর্ষু রোগীদের পৌঁছে দেয়। একইভাবে ডাক্তারদের দেওয়া এক্স-রে ও অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্রেও এজেন্ট ও কমিশনের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি ডাক্তাররা বেশিরভাগ সময় চেম্বার ও নার্সিংহোমে কাটিয়ে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডিউটি করতে যেতে দেখা যায়। ফলে রোগীদের ভিড়ে ঠাসাঠাসি হাসপাতালে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের নামমাত্র চিকিৎসা করে আবার নার্সিংহোম ও নিজস্ব চেম্বারে ছুটতে হয়।

এইসব নামিদামি ডাক্তারের ওপর কোনও প্রকার সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিংবা পর্যবেক্ষণ না থাকার দরুন তাঁরা খেয়ালখুশি মতো হাসপাতালে যান। যদিও নামেই রোগী কল্যাণ সমিতি প্রায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে রয়েছে এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দলে দলে রোগী দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সুচিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করছে। সুতরাং যতদিন না বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার মান বৃদ্ধি করে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে, ততদিন জেলায় জেলায় বড়ো মেডিক্যাল কলেজ কেবলমাত্র দেখার জন্যই থাকবে। বাস্তবে তার সুফল রোগীরা মোটেই পাবে না, এটা অপ্রিয় হলেও সত্যি। □

# নামেই তো এসে যায়!

সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, লখনউ শহরের নাম বদলের পরিকল্পনা করেছে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। লখনউয়ের কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে অওধ ও ফৈজাবাদ শহরের কথা। সঙ্গে মনে পড়ে ভীরু, অলস, ভোগ বিলাসে মত্ত নবাব সুজা-উদ-দৌলার কথা। আর সবশেষে মুন্সি প্রেমচাঁদের ছোটো গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের প্রথম হিন্দি ছবি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী'র কথা। যে ছবি দেখতে বসলে আজও সময় ভুলে যাই। ইতিমধ্যে যোগী সরকার এলাহাবাদের নাম বদলে 'প্রয়াগরাজ', মুঘলসরাই জংশনের নাম বদলে 'দীনদয়াল উপাধ্যায়', গোরক্ষপুরের মিঞা বাজারের নাম বদলে 'মায়া বাজার' এবং 'ফৈজাবাদ স্টেশনের নাম বদলে 'অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট' করে দিয়েছেন। সম্প্রতি বিজেপি সংসদ সঙ্গমলাল গুপ্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে পত্র মারফত রাজধানী লখনউ শহরের নাম পরিবর্তন করে লক্ষ্মণপুর করার আর্জি জানিয়েছেন। প্রচলিত কথা অনুযায়ী ভগবান শ্রীরাম ভাই লক্ষ্মণকে লখনউ শহরটি উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ শহরের নাম পরিবর্তন করে নর্মদাপুরম করা হয়েছে। বলা হয় নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরের আগের নাম নর্মদাপুরমই ছিল। গাজিপুরের জেলা অধ্যক্ষ বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ রাজভর গাজিপুর শহরের নাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নামে পরিবর্তন করবার দাবি জানিয়ে বলেছেন, 'যারা ইতিহাস ভুলে যায়, তারা কখনও ইতিহাস তৈরি করতে পারে না।'

ইতিমধ্যে দেশের বেশ কিছু স্থানের নাম পরিবর্তনের দাবি উঠেছে, যেমন— রাজা চন্দ্রসিংহের রাজত্বের শহর, যা আজ কাঁচের চুড়ির শহর ফিরোজাবাদ নামে খ্যাত, সেই শহরের নাম বদলে 'চন্দ্রনগর', আগ্রা শহরের নাম বদলে অগ্রবন এবং গুজরাটের আমেদাবাদ শহরের নাম পরিবর্তন করে 'কর্ণাবতী' রাখার দাবি করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ছাত্র সংগঠন। নামবদল বিতর্কে সরগরম দেশ। দেশের এক শ্রেণীর মানুষ নাম পরিবর্তনের পক্ষ নিয়ে বলেছে, নাম পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া ৭০ বছর আগেই শুরু করা উচিত ছিল। আগমার্কা বুদ্ধিজীবী দল রে-রে করে উঠে গেল-গেল রব তুলে বলছে সেই পরিচিত কথা— 'নামে কী এসে যায়?' দেশে নাম পরিবর্তন কিছু নতুন নয়, মাদ্রাজ চেন্নাই হয়েছে, বম্বে মুম্বাই হয়েছে, সুতানুটি-গোবিন্দপুর ক্যালকাটা থেকে কলকাতা এবং কলকাতার প্রাণ কেন্দ্র ধর্মতলা হয়েছে, 'লেলিন সরণি', ঐতিহ্যবাহী 'হগ' মার্কেট হয়েছে, 'নিউ মার্কেট'। মুঘল শাসনকালে যে মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার মতোই নামেও মুঘলাইকরণ করা হয়েছে সে বিষয়ে আজ সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। মুঘল শাসকের দেওয়া এলাহাবাদের নাম ছিল আল্লাহবাদ। অর্থাৎ 'আল্লার বাসস্থান'। হিন্দুরা সে নাম নিজেদের মতো করে নিয়ে এলাহাবাদ উচ্চারণ করেছে। বিখ্যাত মার্কিন লেখক ডেল কার্নেগী বলেছেন, 'সব ভাষাতে প্রিয় হলো তার নাম'। তাই আমি বলবো, 'নামে অবশ্যই এসে যায়।'

**—সঞ্জীব দে,**
আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বাই।

# রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিরসনে সদর্থক ভূমিকা প্রয়োজন

ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখে রাশিয়া ইউক্রেনের লড়াই এক বছরে পদার্পণ করল। এই লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউক্রেনের ন্যাটোর অন্তর্ভুক্তি। পুতিন রাশিয়ার সর্বময় কর্তা। এই লড়াইয়ের লক্ষ্য কারণের থেকে অছিলাই বেশি। ইউক্রেন ইউরোপীয় দেশ, সমৃদ্ধিশালী। সাবেক রাশিয়া ইউনিয়নের থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই গত শতকের আটের দশকে গর্বাচভের আমলে। এরপর থেকে ইউক্রেন রাশিয়ার মতো সার্বভৌম দেশ। তার বিদেশ নীতি আছে, তার অধিকারের মধ্যে পড়ে কোন জোটের অন্তর্ভুক্ত সে হবে। একটা সার্বভৌম দেশের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে অন্য দেশ নাক গলাতে পারে না। এই বিষয়ে আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা চুপচাপ। অথচ গত শতকে আমেরিকা- ভিয়েতনামের লড়াই নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত গলা চড়াত এরা।

আগেই বলেছি ইউক্রেন সমৃদ্ধিশালী দেশ। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, কৃষিপণ্য বিশেষ করে ভোজ্যতেল রপ্তানিতে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে দেশটির। শিক্ষা বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞানে বেশ উন্নত। ভারতের বহু ছাত্র-ছাত্রী সে দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে। রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পর এরা গভীর সঙ্কটে। দুজন ভারতীয় ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। যারা এই ডামাডোলে ভারতে ফিরেছে তাদের অনেকেই এদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনও কলেজে ভর্তি হতে না পেরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইউক্রেনে ফিরছে। কোভিড যখন দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা দুরমুশ করেছে, পুতিনের এই যুদ্ধ দুনিয়ার অর্থনীতিকে খাদের কিনারে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু এতে কার লাভ হলো? তার একটা খতিয়ান আলোচনা করা যাক। এই যুদ্ধ ইউক্রেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংস করেছে। সার্বিক আর্থিক ক্ষতি গত মাস পর্যন্ত ৭০০ বিলিয়ন ডলার। একসময় খনিজ তেলের দাম বেড়ে হয়েছিল ব্যারেল পিছু ১২০ ডলার। কোভিড অভিঘাতে জর্জরিত বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় যেখানে গতি আসতে পারত সেখানে বেশ কিছু দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই লড়াইয়ে। রাশিয়ারও কিছু কম ক্ষতি হয়নি। সারা ইউরোপীয় দেশগুলো আর্থিক প্রতিবন্ধকতা চাপিয়েছে রাশিয়ার ওপর। রাশিয়া খুইয়েছে ১৪ হাজার তরুণ সৈনিক। এত ক্ষতির পরেও পুতিন গোঁ ধরে রেখেছেন। যুদ্ধ সর্বদা ক্ষতি করে। গত শতাব্দী দুটো বিশ্ব যুদ্ধ দেখেছে, কিন্তু কী লাভ হয়েছে দুনিয়ার।

এখন সময় এসেছে এই যুদ্ধ নিরসনে সব রাষ্ট্র প্রধানদের এগিয়ে আসা। গত এক বছরে দেখা গেছে ইউরোপীয় আর্থিক প্রতিবন্ধকতা পুতিনের ওপর কোনো প্রকার প্রভাব ফেলতে পারেনি, উপরন্তু পুতিনের জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার অন্যত্র ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত দেশ যেমন সুইডেন, সুইজারল্যান্ডের মতো দেশগুলো যারা একদা শান্তির কপোত ওড়াতো তারাও আজ জেলেনেস্কিকে অস্ত্র জোগাচ্ছে। ইউক্রেনের ভূমি আজ আমেরিকার ও ন্যাটোভুক্ত দেশের সমরাস্ত্র পরীক্ষাগারে পরিণত। এই পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। জি-২০ সম্মেলনে যোগদান করতে এসে জার্মান চ্যান্সেলর স্কোলজ্ মোদীকে বলেছেন ইউক্রেন শান্তি ফেরাতে মধ্যস্থতা করানোর জন্য। কিন্তু ভারতের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেমন রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সখ্য বহু প্রাচীন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নিক্সন প্রশাসনের চোখ রাঙানির সময় রাশিয়া ভারতের পাশে ছিল। এছাড়া আধুনিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি খনিজ তেল। রাশিয়া ভারতের তেল চাহিদার অনেকটাই মেটায় অপেক্ষাকৃত কম দামে। তাই মোদী সরকার যুদ্ধরে সমর্থন না করলেও সরাসরি রাশিয়র বিরুদ্ধেও যেতে পারছে না। অন্যদিকে ইউক্রেনের সূর্যমুখী তেল অভ্যন্তরীণ ভোজ্যতেলের অনেকটাই চাহিদা মেটায়। এছাড়া লোহা, ইস্পাতের মতো ধাতু রপ্তানি করে ইউক্রেন। সেই সঙ্গে ভারতের বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী সেদেশে ডাক্তারি পড়ে। এদের ভারতে নিয়ে এসে পড়ানোর পরিকাঠামো নেই। কিন্তু কিছু বাধ্যবাধকতার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাবে সরাসরি বিরোধিতা না করলেও ভোটাভুটিতে যোগ দিচ্ছে না চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে। সে যাই হোক, যুদ্ধ কখনও কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারে না। আলাপ-আলোচনা অনেক সময় গুলি-বন্দুকের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। আজ নরেন্দ্র মোদী সর্বজন স্বীকৃত বিশ্ব নেতা। এই লড়াই থামাতে বিবদমান দুই পক্ষকে আলোচনার টেবিলে আনতে ভারতই সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে। দুনিয়ার কোনও দেশ একা বাঁচতে পারে না। ভারতের যেমন দরকার রাশিয়ার তেল, তেমনি ইউক্রেনের ভোজ্যতেল, ইস্পাত বা ভারতীয় ছাত্রদের ডাক্তারি পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা এক নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলি।

# প্রসঙ্গ : ভারতের সংবিধান

গত ৬.১২.২০২১ তারিখের স্বস্তিকার 'অতিথি কলম'-এ শীর্ষ আদালতের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী বলেছেন— দেশের মানুষের কাছে আমাদের সংবিধানই শ্রেষ্ঠ আলোকবর্তিকা। আরও কয়েকটি তারিখের স্বস্তিকাতে আমাদের সংবিধান নিয়ে লেখা পড়েছি। সেগুলির কোনো লেখকই ভারতের সংবিধানের বিরূপ সমালোচনা করেননি; এক মাত্র ব্যতিক্রম দুর্গাপদ ঘোষ। ৭.২.২০২২ তারিখের স্বস্তিকাতে তিনি লিখেছেন— আমাদের সংবিধান রচয়িতাদের নিয়ে যতই অহংকার করা হোক না কেন, তাঁদের শীর্ষস্থানীয়র প্রায় সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত। তাঁরা বস্তুত অলিখিত ব্রিটিশ সংবিধানকে তথা ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যাটার্ন-এর সংবিধানকে প্রায় অনুলিপির মতো করে সংবিধান রচনা করেছেন। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তা পরম্পরাগত ভারতীয় জীবনশৈলীর সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেনি। পুরোপুরি একাত্ম হতে পারেনি। কিন্তু শুধু 'অলিখিত' ব্রিটিশ সংবিধান নয়, সংবিধান তৈরির সময় ড. আম্বেদকর অনেক দেশের সংবিধান ঘেঁটেছিলেন জানতাম। রঞ্জনা মিশ্রর নিবন্ধ (স্বস্তিকা, ৩১.০১.২০২২) পড়ে জানলাম, সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য সংবিধান সভার উপদেষ্টা বি.এম. রাওয়ের পরামর্শে ড. আম্বেদকর ৪০টি দেশের সংবিধান অধ্যয়ন করেছিলেন।

দুর্গাপদবাবুর 'বিশেষ প্রতিবেদন'-এর শিরোনাম ছিল, 'সংবিধানে দেশের মাটির গন্ধ থাকা দরকার'। তিনি তাঁর চার পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে অনেক বিষয়ে আমাদের তথ্য-সমৃদ্ধ করেছেন; কিন্তু সেখানে ভারতের সংবিধানে বিজাতীয় গন্ধের কোনো সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না পেয়ে একটা পত্রাঘাত করেছিলাম। সাড়া মেলেনি। মনে হয় সম্পাদক মহাশয়ের বাজে কাগজের ঝুড়িতে পত্রটির গতি হয়েছে। দুর্গাপদবাবু তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদনের উপসংহারে বলেছেন— ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষের কেবল দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতাই নয়, পুরোপুরি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতিক পরম্পরার অনুসারী নতুন সংবিধান রচনা করা বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রস্তাবটি অভিনব এবং অবাস্তব। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর দৃষ্টিভঙ্গীতে, (স্বস্তিকা, ৫.১২.২০২২) : 'আমাদের সংবিধান ভারতের প্রাচীন মহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।'

সাত দশক আগে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলটি ছিল জ্ঞানের মহাকুম্ভ, সেখানে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ড. ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকর, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, সুচেতা কৃপালনি,... এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার-সহ অগণিত বিশিষ্টজন সংবিধান গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখেছেন। আমাদের সহস্রাব্দের নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের আধুনিক বহিঃপ্রকাশ। প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর বাস্তব অনুভব, আজকে যদি আমাদের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হতো আমরা সংবিধানের একটা পাতাও লিখতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

মোদীজীর ভাবনায়, ২৬ নভেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিন। কারণ ওই দিনে ৭৩ বছর আগে আমাদের দেশে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। তিনি মনে করেন দেশে ২৬ নভেম্বর দিনটিকে 'সংবিধান দিবস' হিসেবে পালনের ঐতিহ্য তৈরি করতে হবে যাতে দেশের তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পারে কীভাবে আমাদের সংবিধান রচিত হয়েছিল, কারা সংবিধান রচনা করেছিলেন, কোন পরিস্থিতিতে এটি তৈরি করা হয়েছিল, কেন করা হয়েছিল, কোথায়, কীভাবে এবং কার জন্য সংবিধানের সৃষ্টি হয়েছিল। নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী ভাবনা। কেবল দেশের তরুণ প্রজন্ম নয়, এতে দেশের জনপ্রতিনিধিরাও উপকৃত হবেন।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,** কলকাতা-৬০।

# প্রাচীন ভারতবর্ষে মহিলাদের স্থান

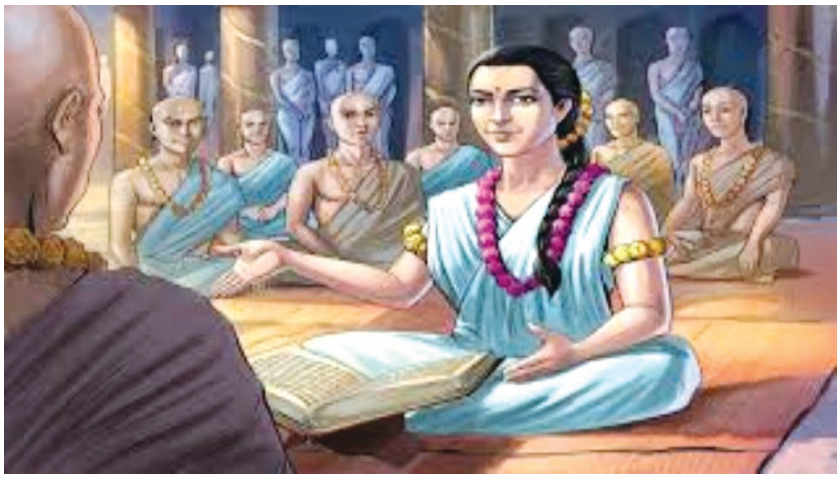

**সুতপা বসাক ভড়**

সুপ্রাচীনকাল থেকে আমাদের এই মাতৃভূমিতে শক্তিবিহীন দেবাদিদেব শিবও হলেন শবমাত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা দেখতে পাই সৃষ্টিকর্তার আপন সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ইচ্ছায় উৎপত্তি হয় নারীসত্তার। ভারতীয় দর্শনে নারীরূপা মাতৃশক্তি সৃষ্টির অভিন্ন অঙ্গ, অখণ্ড সত্তার প্রকাশস্বরূপ।

আমাদের দেশে বৈদিক যুগেও নারীর সমুন্নত স্থানের প্রমাণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের পূর্বপুরুষরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্যবহারিক ও ভাবজগৎ উভয় ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ সমঅধিকারসম্পন্ন। সেই কারণে, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্রহ্মবিদুষী ও তত্ত্বদ্রষ্টা নারীদের আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। অপালা, ঘোষা, রোমশা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রাদের মতো দিব্যভাবসম্পন্না নারী-ঋষিগণের দৃষ্ট সূক্ত, তৎকালীন পুরুষ-ঋষিগণের দৃষ্ট সূক্তের সঙ্গে একত্রে সংকলিত হয়েছে।

সেই সময় অধ্যাত্মসাধনা, সামাজিক, পারিবারিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ছিল সমানাধিকার। বিশেষত, ঋকবেদের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, মহিলারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দচারিণী ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, শিক্ষিত-কন্যা, শিক্ষিত-পুত্রের মতোই মাতা-পিতার একান্ত কাম্য ছিল। এছাড়া বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে নারীর অধিকার ছিল। পুরুষের মতো নারীরও উপনয়নবিধি অবশ্য কর্তব্য ছিল; কারণ বেদপাঠের অধিকার তখনই পাওয়া যেত, যখন কেউ উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হতো। এরপর তাঁরা শিক্ষারম্ভ করতেন এবং যথাসময়ে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতেন। ঋকবেদীয় সমাজে পতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল। স্বয়ংবর সভার উল্লেখ আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারবার দেখতে পাই। আবার পিতৃগৃহে বাসকারী কুমারী কন্যার উল্লেখ আমরা ঋকবেদে পাই। অবিবাহিতা কন্যারা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পেতেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের নারীরা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের 'উপাধ্যায়া' বলে অভিহিত করা হতো। উপনিষদের যুগেও বিদুষী নারীরা প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন— এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী— গার্গী, বাচক্নবী, আদি নারী ঋষি। আমরা দেখতে পাই, যাজ্ঞবল্ক-পত্নী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মৈত্রেয়ীকে, যিনি পার্থিব সম্পদ তুচ্ছজ্ঞান করে অমৃততত্ত্বলাভের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়া কলাবিদ্যাতেও নারীরা বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। সেই যুগের নারীগণ সেলাই ও পশম বস্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন। বস্ত্রালংকরণ কর্মেও তাঁদের নৈপুণ্যের প্রমাণ পওয়া যায়। এছাড়া তুলো থেকে সুতো, সুতো থেকে বস্ত্র তৈরি করতেন। যুদ্ধবিদ্যাতেও পটীয়সী নারীর উল্লেখ আছে। পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থাতেও প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীদের স্থান উল্লেখযোগ্য উন্নত ও মর্যাদাকর ছিল।

আমাদের আদর্শ মৈত্রেয়ী, গার্গী, বাচক্নবীর মতো নারী, যাঁরা বিদ্যাবত্তা, মহিমা ও গৌরবে ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে নিজেদের বিশেষ পরিচয়ের নিদর্শন রেখেছেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা ব্যতিক্রমী। এই ব্যতিক্রমীরাই যুগে যুগে পরিবার, সমাজ, দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেন।

ভগিনী নিবেদিতার রচনায় আমরা দেখি তাঁর অমোঘ বাণী :

'যদি ভারতের মাতৃজাতির মধ্যে সীতা, সাবিত্রীর পুনর্জন্ম ঘটে, আধুনিক যুগের উপযোগী হয়েই তাঁদের নামতে হবে। সেই প্রাচীন ধর্ম, বিশ্বাস, সাহস, দৃঢ়তা এবং ত্যাগ-সহ নতুন নামে গান্ধারীর পুনরাবির্ভাব ঘটুক; দময়ন্তী আবার প্রত্যাবর্তন করুন; ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহধর্মিণী দ্রৌপদীর নবরূপে পুনরাগমন হোক; হে ভরতের নারী, জাগো, জাগো!'

*—পৃষ্ঠা-৩৮, ভারতবাণী।*

# মাথাব্যথা অসুখ হতে পারে, আবার অসুখের লক্ষণও হতে পারে

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

অতিরিক্ত পরিশ্রম, টেনশন, অ্যাংজাইটি কিংবা বড়ো ধরনের অসুখ— যে কোনও কারণেই মাথাব্যথা হতে পারে। মাথাধরা বা হেডেক এমন এক অসুখ বা অসুখের লক্ষণ যা কোনও না কোনও সময় আমাদের সবাইকে বিব্রত করে। কপালের দু'পাশে, চোখের ও কানের উপরে, মাথার পিছন দিকে, এমনকী অনেক সময় ঘাড়েও ছড়িয়ে পড়ে মাথাব্যথা। মাথা ধরাকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; প্রাইমারি হেডেক ও সেকেন্ডারি হেডেক। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৯০ শতাংশ যে কোনও ধরনের প্রাইমারি হেডেকে ভোগেন।

কোনও অসুখজনিত কারণে যদি মাথাব্যথা হয়, তাকে সেকেন্ডারি হেডেক বলা হয়। এই অসুখ সাধারণ জ্বরজারি কিংবা ব্রেন টিউমার, স্ট্রোক বা মেনিনজাইটিসের মতো মারাত্মক অসুখও হতে পারে। অন্যান্য রোগের জন্য আমরা যে সব ওষুধ খাই, তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মাথা ধরতে পারে।

গর্ভনিরোধক পিল, অ্যান্টিঅ্যালার্জিক পিল এবং কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ নিজের খেয়ালখুশি মতো খাবেন না। ডাক্তার প্রেসক্রাইব করলে তবেই খাবেন। বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকার জন্য অনেক সময় অ্যাসিডিটি হয়ে মাথা ধরে। এই মাথাব্যথা এড়াতে প্রতিদিন সময় মেনে খাওয়া খুব জরুরি। মাথা ধরার প্রধান কারণ হলো মাইগ্রেন। সপ্তাহে দু-তিনবার কপাল ও চোখের চারপাশে একটানা ব্যথা হওয়া এবং গা বমি করা মাইগ্রেনের প্রাথমিক লক্ষণ। যদি এই লক্ষণগুলো বারবার দেখা যায়, অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। একটু মাথা ধরলেই পেনকিলার খাওয়ার বদ অভ্যেসটা আমাদের অনেকেরই আছে। কাজেই এটা ঠিক নয়।

মাইগ্রেন এমন একটি রোগ যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে মাথা ধরা। মাথাব্যথা মাইগ্রেন রোগীদের নিত্যসঙ্গী। মহিলারা পুরুষদের থেকে বেশি মাইগ্রেনে ভোগেন। কপালের দু-পাশে অসহ্য ব্যথা, আলো ও শব্দ সহ্য করতে না পারা, গা গোলানো, বমি পাওয়া— এসবই মাইগ্রেনের লক্ষণ। এই মাথাব্যথা চলতে পারে বেশ কয়েক ঘণ্টা বা কখনও গোটা দিন জুড়ে। মাইগ্রেনে ভোগেন যাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু খাবার কম খাওয়া উচিত বা না খাওয়াই ভালো।

আজকের জেট যুগে হাইপারটেনশন আমাদের নিত্যসঙ্গী। হাইপারটেনশন থেকে মাথাধরা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যোগাসন, প্রাণায়াম, স্ট্রেস রিলিভিং এক্সারসাইজ নিয়মিত করলে হাইপারটেনশন থেকে খানিকটা মুক্তি পাওয়া যায়। হাইপারটেনশন থাকলে নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। ডায়াবেটিস থেকেও মাথা ধরতে পারে। এক্ষেত্রে মাথা ধরার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত গলা শুকিয়ে যায় এবং প্রস্রাব পায়। পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে এবং পিরিয়ডের প্রথম দিন অনেক মেয়েই মাথাব্যথায় কষ্ট পান। এই সময়ে শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের লেভেল নেমে যাওয়ায় এই বিপত্তি ঘটে। চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে তবেই পেনকিলার খাবেন।

মাথা ধরার সঙ্গে জ্বর, বমি, ঘাড়ে গলায় ব্যথা আসলে ব্রেন ইনফেকশন বা মেনিনজাইটিসের লক্ষণ হতে পারে। মাথা ধরার জন্য যদি কেউ হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, তা কনকাশন, এনসেফালাইটিস বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষণের কারণে হতে পারে। দিনের পর দিন একইভাবে মাথাব্যথা এবং ক্রমাগত বমি হওয়া ব্রেন টিউমার বা মস্তিষ্কের অন্য কোনও অসুখের সংকেত হতে পারে।

যদি টেনশন জনিত কারণে মাথাব্যথা হয় ঈষদুষ্ণ জলে কয়েক ফোটা ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে স্নান করুন। তারপর শুকনো গামছায় গা মুছে ঠাণ্ডা জায়গায় কিছুক্ষণ রিল্যাক্স করুন। আপনার নার্ভ শান্ত হবে, টেনশন কমবে এবং ভালো ফল পাবেন। মাথা ধরার সময়ে পেঁয়াজ-রসুন তেলমশলা দেওয়া খাবার এড়িয়ে চলুন।

আমরা যখন ক্লান্ত থাকি তখন মাথা ধরে। টেলিভিশন বা রেডিয়োর ছবি ও আওয়াজ সেই মাথা ধরায় ইন্ধন জোগায়। এই ধরনের মাথাধরা এড়াতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে শুতে যান। রাতে হালকা খাবার খান। বেশি রাত করে খাবেন না। বেশি তেল, ঝাল, মশলাযুক্ত খাবার শোয়ার আগে না খাওয়াই স্বাস্থ্যকর। শোয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে টিভি, রেডিয়ো ও মোবাইল বন্ধ করে দিন।

ড্রাই ফ্রুটস বা বাদাম খাওয়া অনুচিত, কারণ বাদাম মাথা ধরা বাড়িয়ে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়াদাওয়া করুন। সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে থাকবেন না। সকালে উঠে চা, লেবু দেওয়া গরম জল বা ফলের রস খেলে শরীরের সুগার লেভেল নর্মাল থাকে। লাঞ্চ বা ডিনারে ভাত বা রুটি খেতে পারেন। সময়াভাবে স্যান্ডউইচ, নুডলস, ফল খেয়ে খিদেটা সাময়িকভাবে মিটিয়ে নিন। □

## জম্মু কাশ্মীরে লিথিয়াম ধাতুর আবিষ্কার

# দেশের শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে

**আনন্দ মোহন দাস**

সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীরে লিথিয়াম আবিষ্কার হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে দেশ আত্মনির্ভর হওয়ার পথে আর এক কদম এগিয়ে গেল। পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়নে এই ধাতুর গুরুত্ব অপরিসীম। বলাবাহুল্য ভারতবর্ষ যে খনিজ সম্পদে কতটা সমৃদ্ধ তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে নতুন সংযোজন হলো বহু মূল্যবান ধাতু লিথিয়াম। এই ধরনের আরও কত সম্পদ অনাবিষ্কৃত রয়েছে তা ভবিষ্যৎই বলবে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি ভূতত্ত্ব বিভাগ ঘোষণা করেছে যে জম্মু ও কাশ্মীরে ৫.৯ মিলিয়ন টন লিথিয়াম ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশ্বের সব দেশকে এই ধাতুর প্রয়োজনে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের উপরই নির্ভর করতে হয়। সারা বিশ্বে এই মহা মূল্যবান বিরল ধাতুর উপস্থিতি মাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখন সপ্তম দেশ হিসেবে ভারতবর্ষও বিশ্বে এই শ্রেণীর দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত হলো যা কিনা ভারতবাসীর কাছে খুবই গর্বের বিষয়। ভারত এখন বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম লিথিয়াম ভাণ্ডারের দেশ। স্বাধীনতার অমৃতকালে এই ধরনের বিরল ধাতুর সন্ধান পাওয়া দেশের অর্থনৈতিক

## ভারতে যে পরিমাণ লিথিয়াম পাওয়া গেছে তার বাজারদর ৩,৩৮,৪০০,০০০০০০ টাকা

• ভারতের ভূ-তাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগ জম্মু ও কাশ্মীরে ৫.৯ মিলিয়ন টন বা ৫৯ লক্ষ টন লিথিয়ামের সন্ধান পেয়েছে।

• বিশ্বে মোট ৯৮ মিলিয়ন টন লিথিয়ামের ভাণ্ডার রয়েছে। তার সাড়ে ৫ শতাংশের কিছু বেশি পাওয়া গেছে ভারতে।

• বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে লিথিয়াম রয়েছে বলিভিয়ায়। সেখানে মোট ২১ মিলিয়ন টন লিথিয়ামের ভাণ্ডার আছে।

• বলিভিয়ার পরের স্থানে রয়েছে আর্জেন্টিনা। সেখানে লিথিয়ামের পরিমাণ ২০ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ২ কোটি টন।

• তিন নম্বরে রয়েছে আমেরিকা। সেখানে মজুত রয়েছে ১২ মিলিয়ন টন লিথিয়াম।

• তারপরেই রয়েছে চিলি। সেদেশে লিথিয়ামের পরিমাণ ১১ মিলিয়ন টন বা ১ কোটি ১০ লক্ষ টন।

• অস্ট্রেলিয়া রয়েছে পঞ্চম স্থানে। সেখানে লিথিয়ামের পরিমাণ ৭.৯ মিলিয়ন বা ৭৯ লক্ষ টন।

• চীনে লিথিয়াম রয়েছে ৬.৮ মিলিয়ন বা ৬৮ লক্ষ টন। চীন রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে।

• চীনের পরেই সপ্তম স্থানে রয়েছে ভারত। এখানে মোট লিথিয়ামের পরিমাণ ৫.৯ মিলিয়ন টন বা ৫৯ লক্ষ টন।

• বর্তমানে ১ টন লিথিয়ামের বাজারদর ৫৭.৩৬ লক্ষ টাকা। সেই হিসেবে ভারতে মজুত লিথিয়ামের মূল্য তিন লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো কোটি টাকা। (বিশ্ববাজারে লিথিয়ামের দর ওঠানামার ক্ষেত্রে টাকার অঙ্ক হেরফের হবে)

ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। সারা বিশ্বে ভারত কূটনৈতিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। এই লিথিয়াম নামক ধাতুটির খোঁজ পাওয়া ভারতের পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বে সুপারপাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এই ধাতুর প্রয়োজনীয়তা যে অপরিসীম তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমেরিকার ভূতত্ত্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে আনুমানিক মাত্র ৯৮ মিলিয়ন টন লিথিয়ামের ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু সারা বিশ্বে কেবলমাত্র ২২ লক্ষ মিলিয়ন টনের কিছু বেশি পরিমাণ লিথিয়ামই নাকি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এই দামি পদার্থের বিশ্বব্যাপী অভাব রয়েছে। উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ২১ মিলিয়ন টন লিথিয়াম রয়েছে বলিভিয়ার কাছে। অস্ট্রেলিয়ার কাছে রয়েছে ৭.৯ মিলিয়ন টন, আর্জেন্টিনার কাছে ২০ মিলিয়ন টন, পর্তুগাল ১.৫ মিলিয়ন টন, চীন ৬.৮ মিলিয়ন টন এবং আমেরিকার রয়েছে মাত্র ১২ মিলিয়ন টন। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতের ৫.৯ মিলিয়ন টন লিথিয়ামের সন্ধান পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিপুল পরিমাণ লিথিয়ামের উৎস পাওয়া গিয়েছে জম্মু কাশ্মীরের রিয়েসি জেলার সালাম-হেমনা এলাকায়। লিথিয়াম হলো হালকা নরম ধাতু এবং মূলত এই ধাতু লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নির্মাণে আবশ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের ব্যাটারি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, ল্যাপটপ, ইলেকট্রিক পরিবহণ, ই-বাইক, ই-মোটরকার ইত্যাদি এমনকী ড্রোনের জন্যও একমাত্র এই ব্যাটারি ব্যবহৃত হয়।

কাঁচ ও সেরামিকের সঙ্গে লিথিয়াম মিশিয়ে শক্তিশালী করা হয়, অ্যালুমিনিয়াম ও তামার সঙ্গে লিথিয়াম মিশ্রণে বিমানের কাঠামো নির্মাণে ওজন হালকা রাখা হয়। এমনকী নির্দিষ্ট কিছু মানসিক রোগের ওষুধেও নাকি এই ধাতুর ব্যবহার রয়েছে বলে জানা যায়। এই লিথিয়াম হালকা হওয়ায় ব্যাটারি সেল নির্মাণে খুব উপযোগী এবং কাঁচা মাল হিসেবে লিথিয়াম প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের তাগিদে এমনকী আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বাজেটে লিথিয়াম আমদানিতে কর হ্রাস করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ২০৩০ সাল পর্যন্ত লিথিয়াম যুক্ত আয়ন ব্যাটারির চাহিদা পূরণ করতে লিথিয়ামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। এই মূল্যবান লিথিয়াম ধাতুটি কোনো দেশই অন্যকে সহজে সরবরাহ করতে চায় না, কেবলমাত্র এর দ্বারা নির্মিত উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করতে চায়। চীনের কাছে ৬.৮ মিলিয়ন টন লিথিয়াম রয়েছে এবং বিশ্বের অনেক ব্যাটারি নির্মাতা সেখানে কারখানা খুলে চুটিয়ে ব্যবসা করছে।

উদাহরণ স্বরূপ, টেসলার মতো বহুজাতিক ইলেকট্রিক ভেহিক্‌ল নির্মাতা কাঁচামালের সুবিধা থাকায় চীনে গাড়ির কারখানা খুলে ব্যাপক ব্যবসা করছে। ভারতের প্রয়োজনে চীন এই ধাতুটি ভারতকে সরবরাহ না করে শুধু মাত্র লিথিয়াম যুক্ত ব্যাটারি রপ্তানি করে। মোবাইল ফোন-সহ যে কোনো ইলেকট্রনিক দ্রব্যের ব্যাটারি এতদিন ভারত বেশিরভাগ চীন থেকে আমদানি করেছে। যার ফলে ভারত এই বিষয়ে চীনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই লিথিয়ামের ভাণ্ডার চীনের কাছে থাকায় চীন খুব সস্তায় মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ-সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য বিশ্বব্যাপী বিক্রি করে প্রচুর আয় করেছে। চীনের উন্নয়নের পিছনে এই লিথিয়াম ধাতুটির অবদান অস্বীকার করা যায় না। বলা বাহুল্য আগামীদিনে লিথিয়াম যুক্ত ব্যাটারির চাহিদা মেটাতে কিছুদিন আগে এই লিথিয়ামের আমদানির জন্য সুদূর চিলি, আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়ার সঙ্গে দোস্তি বাড়াবার জন্য আমাদের দেশ উদ্যোগ নেয়। সেই লক্ষ্যে এমনকী রাষ্ট্রপতি ও বিদেশ মন্ত্রী এই তিনটি দেশ সফর করেছেন। কিন্তু এখন আর সেই প্রয়োজন রইল না। আমাদের বিপুল পরিমাণ সঞ্চিত এই লিথিয়াম ভাণ্ডার ভারতের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা অর্জনে আমরা সক্ষম হব। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতি মজবুত হবে। বিশ্বসংস্থাগুলির অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বকে পরিবেশ দূষণ মুক্ত ও কার্বন মুক্ত করতে সব দেশের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে কোনো সন্দেহ নেই।

এই অমূল্য ধাতুর আবিষ্কারের ফলে ভারতে এখন এই ধরনের অনেক ব্যাটারি নির্মাণ কারখানা খুলে যাবে। তার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে, প্রচুর কর্মসংস্থান হবে এবং বেকার সমস্যার সমাধান হবে। শিল্পের উন্নয়নে সরকারের রাজস্ব আদায়ও বৃদ্ধি পাবে। ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব পড়বে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই বিরল ধাতুর উৎস জম্মু ও কাশ্মীরে হওয়ায় এখানে লিথিয়াম যুক্ত ব্যাটারি নির্মাণের জন্য অনেক কারখানা খুলে যাবে। সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা বাতিল হওয়ায় বহু শিল্পপতি কাশ্মীরে কারখানা খুলতে এগিয়ে আসবে। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক শিল্পের দরজাও খুলে যাবে। অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগে জম্মু-কাশ্মীরের বেকার সমস্যার সমাধান হবে। তার ফলে এখানে সার্বিক উন্নয়নে গতি আসবে। এখানকার জ্বলন্ত সমস্যা বেকারত্ব দূর হলে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ হ্রাস পাবে এবং জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসবে। বিশ্বের কাছে ভারতের মান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০৭০ সালের মধ্যে দেশকে কার্বন মুক্ত করার যে অঙ্গীকার বাজেটে নেওয়া হয়েছে তা ফলপ্রসূ করতে এই ধাতুর আবিষ্কার অত্যন্ত সহায়ক হবে। কার্বন মুক্ত ও দূষণ মুক্ত আবহাওয়া নির্মাণে বিশ্বে পেট্রোলিয়াম পদার্থের ব্যবহার কমিয়ে ইলেকট্রিক বাহনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকটি দেশ পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এর জন্য সারা বিশ্বে লিথিয়াম যুক্ত ব্যাটারির বিপুল পরিমাণ চাহিদা মেটাতে এই ধরনের ব্যাটারির উৎপাদন সমপরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশ্বে ভারত সুপার পাওয়ার হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়নে এই ধাতু সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবে। জম্মু ও কাশ্মীরে এই লিথিয়াম ধাতুর আবিষ্কার অবশ্যই ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার হয়ে উঠবে। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির চাহিদা মেটাতে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল থাকার প্রয়োজন হবে না। একথা জোর দিয়ে বলা যায়, এই বিপুল পরিমাণ লিথিয়াম আবিষ্কারের ফলে ভারতে আগামী দশ বছরে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক শিল্পে ও বিদ্যুৎ পরিবাহী যানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ■

# জম্মু-কাশ্মীরে লিথিয়াম— অর্থনৈতিক ভাবে বিশ্বের পরিচালক হওয়ার পথে ভারত

**রামানুজ গোস্বামী**

সম্প্রতি ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার সালাল-হাইমানা অঞ্চলে ৫.৯ মিলিয়ন টন পরিমাণ লিথিয়ামের এক বিপুল ভাণ্ডারের হদিশ মিলেছে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া জানায় যে, নিশ্চিত রূপেই সালাল-হাইমানা অঞ্চলে রয়েছে ৫.৯ মিলিয়ন টনের এক বিশাল লিথিয়াম ভাণ্ডার যা আগামীদিনে ভারতের অর্থনীতিকে নিঃসন্দেহে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিতে পরিণত করবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

লিথিয়াম হলো এক বিরল তথা অতি দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ যা বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন, বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ছাড়া আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রকৃতপক্ষে কল্পনাও করা যায় না। তাই, এই কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, লিথিয়াম হলো সেই বস্তু যা বর্তমান যুগে ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সমূহের চাবিকাঠি।

এবারে আরও একটি ক্ষেত্রের কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হবে। তা হলো বর্তমানে সারা পৃথিবীতে বেড়ে চলেছে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা। এই কার্বন-মনোক্সাইডের (CO) পরিমাণ বেড়েই চলেছে এবং পরিবেশের ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করে চলেছে। এই ভাবে চলতে থাকলে মানবজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাছাড়া, ক্রমাগত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলে পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডারও আজ বহুল পরিমাণে নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি নতুন ভাবে প্রস্তুত করা বা পুনর্নবীকরণ করা যায় না।

তাই খুব হিসাব করে এগুলির ব্যবহার করতে হয়। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই সবের সুযোগ-সুবিধা লাভ করা থেকে বঞ্চিত না হয়। এতে পরিবেশও থাকে সুরক্ষিত এবং উন্নয়নও বজায় থাকে।

উল্লেখ্য যে, ২০৭০ সালের মধ্যে ভারত কার্বন এমিশনের যে লক্ষ্যমাত্রা (অর্থাৎ একেবারে শূন্য পর্যন্ত যে লক্ষ্য) স্থির করেছে, তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল বিকল্প খনিজের উৎস সন্ধান। আগেই বলেছি যে, পরিবেশ দূষণ তথা sustainable development-এর কারণে সারা পৃথিবীই আজ বৈদ্যুতিক গাড়ির দিকে ঝুঁকছে। মনে করা হচ্ছে যে, পৃথিবীতে লিথিয়ামের চাহিদা ২০২৫ সালে বর্তমানের চেয়ে তিনগুণ হয়ে দাঁড়াবে এবং ২০৩০ সালে তা ২ মিলিয়ন টনকেও ছাপিয়ে যাবে। ভারত মূলত নিজের লিথিয়াম চাহিদার শতকরা ৭০ ভাগই আমদানি করে চীন ও হংকংয়ের মতো দেশ থেকে। সুতরাং এর প্রয়োজন আর হবে না এবং লিথিয়াম আমদানিকারক দেশ থেকে উন্নীত হয়ে ভারত হয়ে উঠতে চলেছে পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ লিথিয়াম রপ্তানিকারক দেশ। তাই, খুব সহজেই অনুমেয় যে, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে আসতে চলেছে এক বিপুল জোয়ার, যা দেশের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে বিশ্বের সামনে ভারতকেই পরিচালকের আসনে বসিয়ে দেবে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, মোদী সরকার ভারতের বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে বিপ্লব আনতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট। যদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে না হয় সেক্ষেত্রে ব্যাটারির উৎপাদন ব্যয় অনেক কম হবে। এখানকার গাড়ি একসময় সাধারণের নাগালেই চলে আসবে। ঠিক যেমন করে আজ সমাজের একটা বড়ো অংশই ব্যবহার করতে পারে স্মার্টফোন। ভারত সরকারের লক্ষ্য, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ির শতকরা ৩০ শতাংশ, বাণিজ্যিক গাড়ির শতকরা ৭০ শতাংশ এবং দুই ও তিন চাকার যানবাহনের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ শতাংশই বৈদ্যুতিক গাড়ির আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিয়ে আসা। পরিবহণ ক্ষেত্রে কার্বনের নিঃসরণ কমাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ ভারত সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশের খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে নবতম সংযোজন এই লিথিয়াম ভাণ্ডারের আবিষ্কার। নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনীতির চালচিত্রকেই বদলে দেবে এই লিথিয়াম প্রাপ্তির ঘটনা। ভারত আগামীদিনে হতে চলেছে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশগুলির মধ্যে উন্নততর এবং অদূর ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীকেই তাকিয়ে থাকতে হবে ভারতের দিকে বা তার সামর্থ্য, সম্ভাবনা তথা উদ্ভাবনীশক্তির দিকে— লিথিয়াম প্রাপ্তি সেই নবদিগন্তেরই সূচনা করেছে, এই কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

# সাদা সোনায় উজ্জ্বল হবে ভারতের অর্থনীতি

**বিমলশঙ্কর নন্দ**

পেট্রোলিয়ামকে 'তরল সোনা' বলা হয় বহুদিন ধরে। কারণ আধুনিক সভ্যতার গতি পুরোপুরি পেট্রোলিয়ামের ওপর নির্ভরশীল। তাই তা সোনার মতোই দামি। তবে সাম্প্রতিককালে আর একটি খনিজ পদার্থকেও সোনার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। একটি সাদা রঙের নরম ধাতু যাকে সোনার সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় 'হোয়াইট গোল্ড'। রিচার্জেবল ব্যাটারির জন্য এই ধাতুটির অগাধ চাহিদা। ধাতুটি হলো লিথিয়াম। যখন বিশ্বজুড়ে পেট্রোলিয়াম অর্থাৎ তরল সোনার বিকল্প খোঁজার কাজ চলছে তখন এই 'সাদা সোনা' অর্থাৎ লিথিয়াম বিকল্প জ্বালানির চাহিদা পূরণ করতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। আর ভারতের পক্ষে সবচেয়ে খুশির খবর হলো ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ লিথিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রের খনি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে জম্মু ও কাশ্মীরে লিথিয়ামের উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে রিয়াসি জেলার সালাল-হাইমানা অঞ্চলে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার হিসাব অনুযায়ী ৫.৯ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ৫৯ লক্ষ টন লিথিয়াম আছে এই অঞ্চলে। স্বাধীনতার পর থেকেই নানা কারণে কাশ্মীর সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে এসেছে। যার কিছু ভালো, কিন্তু অনেকগুলি ছিল উদ্বেগজনক। হিংসা, হত্যা, রক্তপাত ছিল ভূস্বর্গের দৈনিক জীবনধারার অংশ। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর একীভূত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া মনোভাবের কারণে হিংসা ও রক্তপাত উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। লিথিয়াম আবিষ্কার আবার জম্মু ও কাশ্মীরকে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে নিয়ে এলো এবং তা ইতিবাচক কারণে। এক সুন্দর, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে কাশ্মীর, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে।

লিথিয়াম কী? লিথিয়াম হলো রুপোলি রঙের অ্যালকালি ধাতু। ওজনে অত্যন্ত হালকা। এর ব্যবহার হয় নানাক্ষেত্রে যেমন সেরামিক, গ্রিজ, অ্যালুমিনিয়াম, এয়ার কন্ডিশনার প্রভৃতিতে। কিন্তু এর প্রধান ব্যবহার হলো লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে, ইলেকট্রিক গাড়িতে, ল্যাপটপে, মোবাইল ফোনে এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে। পৃথিবীতে লিথিয়ামের ভাণ্ডার খুব বেশি নেই। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে মোট ৯৮ মিলিয়ন টনের মতো লিথিয়াম আছে যার ৫৪ শতাংশই পাওয়া যায় আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া ও চিলিতে। লাতিন আমেরিকার এই তিনটি দেশকে সম্মিলিতভাবে বিশ্বের লিথিয়াম ট্রায়াঙ্গেল (ত্রিভুজ) বলা হয়। গোটা বিশ্বের লিথিয়াম রিজার্ভের ৫.৫ শতাংশ আছে ভারতে।

ভারতে সাম্প্রতিককালে জম্মু ও কাশ্মীরে সে ৫.৯ মিলিয়ন টন লিথিয়াম আবিষ্কৃত হলো, তাতে ভারতও বিশ্বের অন্যতম প্রধান লিথিয়াম উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। একটি হিসেব অনুযায়ী চিলিতে আছে ১৯.৯ মিলিয়ন টন লিথিয়াম, অস্ট্রেলিয়াতে আছে ৬.২ মিলিয়ন টন। ৫.৯ মিলিয়ন টন লিথিয়াম রিজার্ভ ভারতকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান তিনটি লিথিয়াম সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করেছে। ২০২১ সালে কর্ণাটক রাজ্যে ১৬০০ টন লিথিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের লিথিয়াম রিজার্ভ সবদিক দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ১৯৯৯ সালে এই অঞ্চলে লিথিয়ামের সন্ধান পেয়েছিল। যে কোনো অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের আগে অনেকগুলো পর্যায় থাকে। যেমন প্রথম পর্যায় হলো ম্যাপিং। তারপর খনিজ দ্রব্যটির পরিমাণ নির্ধারণ এবং আর্থিক দিক দিয়ে তা লাভজনক কিনা তার বিচার করা হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট এলাকার 'ফিজিক্যাল স্টাডি' করা হয় এবং নমুনা সংগ্রহ করে তার 'কেমিক্যাল স্টাডি' করা হয়। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া তার প্রাথমিক কাজগুলোকে প্রায় শেষ করে ফেলেছে। তবে এখনো কয়েকটি পর্যায় বাকি আছে। ইতিমধ্যে জানা গেছে এই লিথিয়ামের গুণমান যথেষ্টই ভালো। অর্থাৎ বাণিজ্যিকভাবে এই লিথিয়াম নিষ্কাশন লাভজনক হবে।

জম্মু ও কশ্মীরে লিথিয়াম ভাণ্ডারের এই আবিষ্কার নিয়ে এত উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে কেন? এর উত্তর লুকিয়ে শক্তির ব্যবহার এবং সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্তরে ভাবনাচিন্তার পরিবর্তনের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহারে বৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু এই শক্তি আসে মূলত প্রচলিত উৎস থেকে যেমন— তেল, কয়লা, গ্যাস প্রভৃতি। এগুলিকে বলে ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি। গাছপালা, মৃতদেহ প্রভৃতি জীবনের উপাদান হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে এই ধরনের জ্বালানি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় জ্বালানি তৈরি হতে লাগে প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন বছর। এর পরিমাণও অফুরন্ত নয়। ২০০৫-০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীতে যত কয়লা আছে তা দিয়ে ১৪৮ বছর চলবে, খনিজ তেল চলবে ৬১ বছর এবং প্রাকৃতিক গ্যাস চলবে ৪৩ বছর। জীবাশ্ম জ্বালানি পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। যে দেশে পাওয়া যায় তার ওপর অন্যান্য দেশকে নির্ভর করে থাকতে হয়। যে অঞ্চলে এই ধরনের জ্বালানি (বিশেষত পেট্রোলিয়াম) পাওয়া যায় তা আন্তর্জাতিক রাজনীতির উষ্ণশয্যায় পরিণত হয়, যেমন— মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ আরব দুনিয়া। যে দেশে শক্তির ব্যবহার বেশি, তাকে হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করতে হয় তেল ও অন্যান্য প্রচলিত শক্তি আমদানি করতে। ভারত কত তেল আমদানি করে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

অতিমারির বছর ২০২০-২১-এ ভারতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদার ৮৪ শতাংশের বেশি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছিল। ২০২০-২১ সালে ভারতের মোট আমদানির ১৯ শতাংশের বেশি ছিল ৭,৭০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের প্রায় ১৩.৯ কোটি মেট্রিক টন গ্রস পেট্রোলিয়াম আমদানি। তার আগে ২০১৯-২০ সালে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদার ৮৫ শতাংশের বেশি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছিল। ১১,৯০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের ২৭ কোটি মেট্রিক টনের বেশি গ্রস পেট্রোলিয়াম আমদানি ছিল সে বছরের ভারতের মোট আমদানির ২৫ শতাংশ। সামান্য এই তথ্য দিয়েই বোঝানো যায় শুধু তেল আমদানি করতে ভারতকে কী বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। তার সঙ্গে রয়েছে তেলের দাম নিয়ে

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি। পরিবেশের উপর জীবাশ্ম জ্বালানির প্রভাবও মারাত্মক। কারণ জীবাশ্ম জ্বালানিতে কার্বন থাকে। এই জ্বলানির দহন ক্রমেই পরিবেশকে বিপর্যয়ের পথে নিয়ে যায়। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন থেকেই এ নিয়ে উদ্বেগ ধ্বনিত হচ্ছে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে বসুন্ধরা সম্মেলনের পর বিভিন্ন দেশকে পরিবেশ দূষণ রুখতে ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। ভারত আগামী ৫০ বছরে বাতাসে কার্বন নিঃসরণকে শূন্যে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিকল্প শক্তির প্রয়োজনীয়তাকে এই প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। অপ্রচলিত শক্তি হিসেবে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতির ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু এগুলির প্রয়োগ এখনো সীমিত এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে লিথিয়াম। লিথিয়াম চালিত গাড়ি পেট্রোল বা ডিজেল চালিত গাড়ির স্থান নিচ্ছে। এ কারণেই লিথিয়াম এত গুরুত্ব।

১৯৯৬ সালে লক্ষ্ণৌয়ের একটি কোম্পানি প্রথম তিন চাকার ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরি করে। কিন্তু ভারতে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল তৈরিতে জোয়ার আসে ২০১৭ সালের পর থেকে। ভারত হলো বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিচক্রযানের বাজার। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্ত উৎপাদক ব্যাটরি চালিত দ্বিচক্রযান উৎপাদনে বেশি উৎসাহী ছিল। বর্তমানে চার চাকার ছোটো গাড়ি তো বটেই, বিদ্যুৎচালিত বড়ো বাসও তৈরি করা হচ্ছে। সরকারও বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরিতে ব্যাপক উৎসাহ ও আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে। লক্ষ্য হলো তেলের ওপর নির্ভরতা কমানো। ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাটরি তৈরিতে যে লিথিয়াম লাগে ভারতের বাজারে তার চাহিদাও বাড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্যবহারযোগ্য লিথিয়ামের ৮৫ শতাংশ তৈরি করে চীন। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশই তাই ব্যবহারযোগ্য লিথিয়ামের জন্য চীনের ওপর নির্ভর করে। ভারতে ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরিতে লিথিয়ামের চাহিদা যত বাড়ছে লিথিয়াম আমদানি খাতে খরচও বাড়ছে। ২০১৭ থেকে ২০২০-এর মধ্যে ১৬৫ কোটি লিথিয়াম ব্যাটারি আমদানি করেছে যার মূল্য ছিল ৩.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ভারত আমদানি করেছে ১৭৩ কোটি লিথিয়াম ব্যাটারি। এই মুহূর্তে ভারতের গাড়ি বাজারে মোট গাড়ির ১ শতাংশ মাত্র অধিকার করেছে ইলেকট্রিক গাড়ি। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে মোট গাড়ি বাজারের ৩০ শতাংশ হবে ইলেট্রিক গাড়ি— সরকার এই লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। ফলে ভারতে লিথিয়িামের যে বিপুল চাহিদা তৈরি হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভারত যদি আকরিক থেকে ব্যবহারযোগ্য লিথিয়াম তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে তবে ভারতীয় অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার আসবে। ভারতে খনি শিল্পে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ সরকারের অনুমতি পেয়েছে। সুতরাং লিথিয়াম উত্তোলন ও নিষ্কাশনে প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ আসবে। ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ লিথিয়াম আমদানিকারী দেশ। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আমদানির ওপর নির্ভরতা কমবে। বাণিজ্য ঘাটতি কমানো সম্ভব হবে। বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়বে।

ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে মোট গাড়ির ৩০ শতাংশ ইলেকট্রিক গাড়িতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরে লিথিয়াম আবিষ্কারের পর ভারত এখন স্বচ্ছন্দে মোট গাড়ির বেশির ভাগই ইলেকট্রিক গাড়িতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গাড়ি ছাড়াও লিথিয়ামের ব্যবহার হয় কম্পিউটার, মোবাইল ফোন প্রভৃতি শিল্পে। ভারতে এগুলির উৎপাদন ব্যাপকহারে বাড়ছে। আগামী কয়েক বছরে ভারতে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন উৎপাদন বহুগুণ বাড়বে। ভারতে লিথিয়ামে উৎপাদন এই শিল্পকে উৎসাহ জোগাবে।

ভারতে ব্যবহারযোগ্য লিথিয়ামের উৎপাদন শুরু হলে লক্ষ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কাজের সুযোগ্য তৈরি হবে। লিথিয়াম মাইনিং এবং প্রসেসিং লক্ষ লক্ষ কাজের সুযোগ তৈরি করবে মাইনিং সেক্টরে। ভারতে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি তৈরি শুরু হলে উৎপাদন শিল্পে ব্যাপক হারে কাজের সুযোগ বাড়বে। ভারতে রয়েছে বিশাল এক শ্রমশক্তি। শিল্পক্ষেত্রে বিশেষত উৎপাদন শিল্পে কাজের সুযোগ বাড়লে এই শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। ১৯৯৩ সালে ব্রাজিলে রিও-ডি-জেনিরো-তে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সম্মেলনের পর উন্নয়নের এক নতুন শব্দবন্ধ জনপ্রিয় হয়েছে। তা হলো স্থিতিশীল উন্নয়ন। বিশ্বের সমস্ত সম্পদকে ব্যবহার না করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু রাখতে হবে। অন্যদিকে দূষণ কমিয়ে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করতে হবে। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়লে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। পরিবেশ দূষণ কমতে থাকবে। এর সঙ্গে সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির ব্যবহার যদি বাড়তে থাকে তবে আগামী ৫০ বছরে ভারত তার কার্বন নিঃসরণের মাত্রা শূন্যে নিয়ে যেতে অবশ্যই সক্ষম হবে।

ভারত এ বছর বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ২০টি দেশ জি-২০ সভাপতির পদলাভ করেছে। পৃথিবীর সামনে নিজের সাফল্য এবং গুরুত্ব প্রদর্শনের এটা এক বড়ো সুযোগ। ভারত এখন বিশ্বগুরুর মর্যাদায় উন্নীত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে চলে আসা সমস্যার সমাধান করে ভারত এক শক্তিশালী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বিশ্বের মঞ্চে। যে জম্মু ও কাশ্মীর হিংসা ও রক্তপাতের কারণে বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসতো এবার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কাজের সুযোগ দৃষ্টিতে সবার নজর কাড়বে। লিথিয়াম আবিষ্কার কাশ্মীরের অর্থনীতি ও সমাজকে বদলে দেবে। বদলাবে গোটা ভারতের অর্থনীতি। লিথিয়াম খনন শুরু হলে পরিবেশের ওপর যে প্রভাব পড়বে সে ব্যাপারে সরকারি মহলে ইতিমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। লিথিয়াম খনির কারণে যে মানুষজন বাস্তুচ্যুত হবেন তাদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের প্যাকেজ তৈরি করা হবে। গুজরাটের সর্দার সরোবর প্রজেক্টের ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষজন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার মানুষজনও পাবেন। ভারতের মূলমন্ত্রই এখন ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস।’

# স্বস্তিকা ৭৫ বছর উদ্‌যাপন সমিতির প্রথম অধিবেশন

ক্যালকাটা পোর্ট স্ট্রাস্ট অফিসার্স ক্লাবে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বস্তিকা ৭৫ বছর উদ্‌যাপন সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । উদ্‌যাপন সমিতির ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চাসীন ছিলেন সমিতির সভাপতি সৌরভ ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, দক্ষিণবঙ্গ সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী এবং স্বস্তিকার প্রকাশক জয়ন্ত পাল। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অধিবেশনের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন স্বস্তিকার সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি সৌরভ ঘোষ। তিনি বলেন, স্বস্তিকা বিগত সাত দশক ধরে বাঙ্গালি জনমানসে জাতীয়তাবোধের ধারণাকে দৃঢ় করে চলেছে। যুবমানসে স্বস্তিকার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি সমিতির আগামী পরিকল্পনার রূপরেখা সবিস্তারে সদস্যদের সামনে রাখেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন রাখেন স্বস্তিকার সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা। এরপর সদস্যগণ স্বস্তিকার সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে মতামত রাখেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। তাঁকে বরণ করেন সমিতির সভাপতি সৌরভ ঘোষ। ডাঃ সরকারও স্বস্তিকার উন্নতিকল্পে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন সমিতির সদস্য তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। সভা সুচারুরূপে পরিচালনা করেন সমিতির সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শান্তিমন্ত্র উচ্চরণ করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন শ্রীচক্রবর্তী।

## নওপাড়া শিবাজী প্রভাত শাখার বুক স্টল

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি হাওড়া গ্রামীণ জেলার জয়পুর খণ্ডের নওপাড়া শিবাজী প্রভাত শাখার উদ্যোগে নওপাড়া রত্নদ্বীপ যুব সমিতির শ্রীশ্রীকালীপূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলায় একটি বুক স্টল দেওয়া হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন নওপাড়া রত্নদ্বীপ যুব সমিতির সম্পাদক সুভাষ কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বারুজীবী সমিতির সভাপতি জয়দেব সারিকেত, স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আমতা মহকুমা প্রচারক বুদ্ধদেব দাস। জয়পুর খণ্ড শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ গুরুদাস শীলের ব্যবস্থাপনায় মেলার পরিবেশ সঙ্ঘময় হয়ে ওঠে। স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা স্বস্তিকার প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডলকে একটি শাল দিয়ে বরণ করেন। শ্রীমণ্ডলের উদ্বোধনী বক্তব্যের পর পুস্তক বিক্রি শুরু হয়।

# রায়গঞ্জ সারদা শিশু তীর্থে ক্ষত্রিয় সম্মেলন

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ সারদা শিশু তীর্থে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ক্ষত্রিয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ক্ষত্রিয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য গোবিন্দ ঘোষ, প্রান্ত সমরসতা প্রমুখ দিলীপ ভকত, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষীকেশ সাহা, উত্তর দিনাজপুর জেলা সঙ্ঘচালক অপূর্ব দাস প্রমুখ। উপস্থিত অতিথিগণ প্রদীপ প্রজ্বলন এবং উত্তরবঙ্গের মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদক ননীগোপাল রায়। তিনি বাংলাদেশের রংপুরে অনুষ্ঠিত পয়লা মাঘের মহা ক্ষত্রিয় সমিতির চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। উত্তরবঙ্গে সমিতির কাজের অগ্রগতির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি সৌমেন রায়। এছাড়াও তিন জেলার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে ঠিক হয় প্রতি জেলায়, প্রতি ব্লকে সমিতি গঠন করা হবে। প্রতি গ্রামে হরিসভা গঠন করা হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন ও প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন, গণ উপবীত ধারণ, কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, পুস্তক বিতরণ, রক্তদান শিবির, রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য ও পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। তিন জেলা থেকে ৬০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। শেষে শান্তিমন্ত্র পাঠ করে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

# ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের আবির্ভাব দিবস

বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত শিক্ষক তথা হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা গ্রামের রূপকার ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের ১১৭তম আবির্ভাব দিবস

উপলক্ষ্যে দ্বারহাট্টার ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য সরস্বতী শিশুমন্দির গত ২৯ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের আয়োজন করে। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের ক্ষেত্রীয় সংযোজক অরবিন্দ দাস। নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ৪২ জনের সুগার ও প্রেসার, ২৪ জনের ইসিজি, ৩১ জনের ইউরিক অ্যাসিড এবং ৩০ জনের থাইরয়েড পরীক্ষা করা হয়। রক্তদান শিবিরে ৪৮ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা রক্ত দান করেন।

শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য কৌশিক দুলে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত শিশুমন্দির চলছে তাদের আদর্শ হলো শিক্ষা, সংস্কার ও সেবা। অর্থাৎ শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয়, তার সঙ্গে সংস্কার ও সেবার মানসিকতা গড়ে তোলা। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই ভাব জাগিয়ে তোলার জন্য সারা বছর ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য সরস্বতী শিশুমন্দিরেও বিভিন্ন সংস্কার ও সেবামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

# মালদহে মুচিয়া-মহাদেবপুরে সংস্কার ভারতীর চর্চাকেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ২২ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার মুচিয়া-মহাদেবপুর গ্রামে সংস্কার ভারতীর একটি নতুন চর্চাকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী প্রান্ত সভাপতি সঞ্জয় নন্দী, প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ কিশোর কুমার সরকার, মালদা জেলা কোষাধ্যক্ষ সজল দত্ত, মালদা জেলা সহ সম্পাদক শ্রীমতী

রুমা চৌধুরী দে, মালদা চর্চাকেন্দ্রের মুখ্য সংযোজক কৌশিক দাস বকশী প্রমুখ। স্থানীয় সুভাষ দাসকে নতুন চর্চাকেন্দ্রের মুখ্য সংযোজকের দায়িত্ব দেওয়া হয় ।

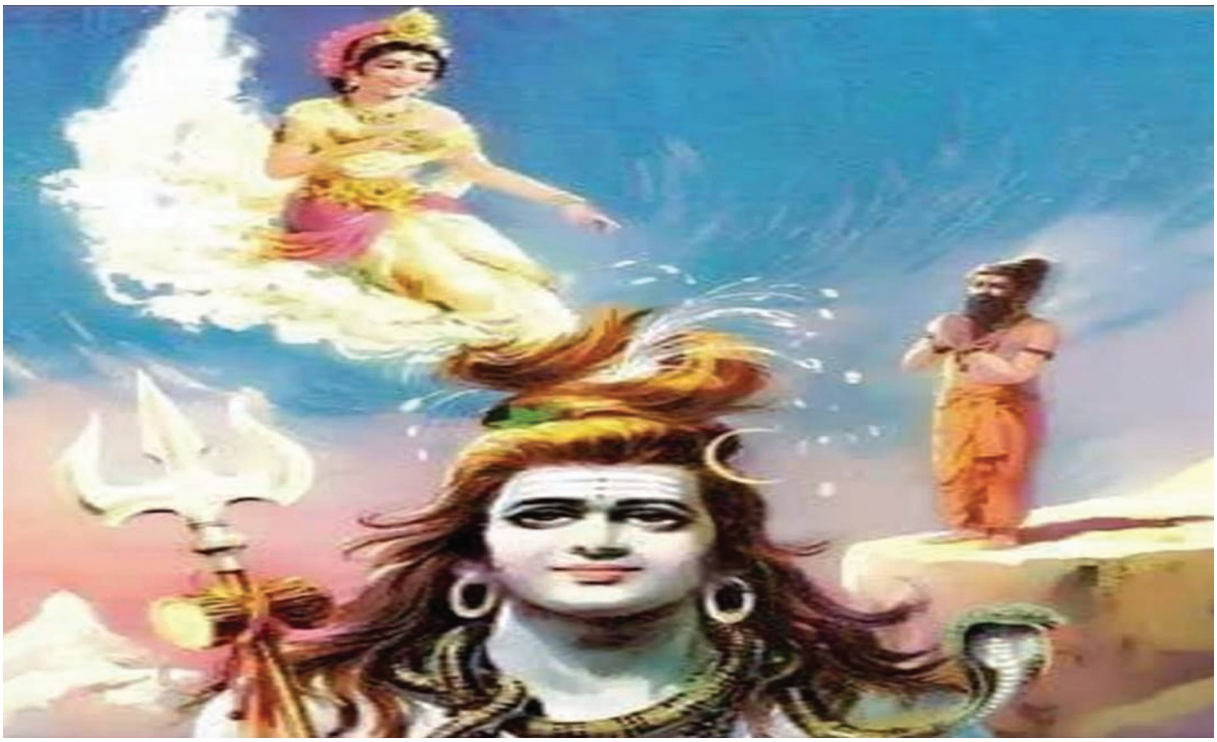

# গঙ্গাসাগরের গল্প, পুরাণকথায় গঙ্গাসাগর

**হীরক কর**

অনেক অনেককাল আগে, সেই পুরাণের যুগে অযোধ্যায় সগর নামে ইক্ষ্বাকু বংশের এক রাজা ছিলেন। বিশাল ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। তাঁর দুই রানি। সুমতি ও কেশিনী। রানি কেশিনীর ছিল এক পুত্র, অসমঞ্জ। আর রানি সুমতির ছিল ষাট হাজার পুত্র। হ্যাঁ ঠিকই পড়েছেন সংখ্যাটা ষাট হাজারই। অসমঞ্জ ছিলেন খুবই দুর্বিনীত। সেই জন্য পিতা সগর তাকে ত্যাগ করেন এবং বনবাসে পাঠান।

আসলে অসমঞ্জ ছিলেন খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল কমবয়সি ছেলেদের জলে ডুবিয়ে দেওয়া। ছেলেরা যখন সরযূ নদীর জলে স্নান করত, রাজকুমার অসমঞ্জ তাদের গভীর জলে ঠেলে দিতেন। তারপর তারা যখন অসহায়ের মতো জলে ডুবে যেত, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন সে দৃশ্য। অসমঞ্জ উপভোগ করতেন ছেলেদের মৃত্যুভয়। দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটতে থাকায় এবং প্রজাদের বারংবার নালিশ শুনে বিরক্ত রাজা সগর রাজপুত্র অসমঞ্জকে পাঠালেন বনবাসে। লোকচক্ষুর আড়ালে।

একাকী...নিঃসম্বল...

কিন্তু এই ঘটনার পেছনে প্রকৃত কারণটা থেকে গেল লোকচক্ষুর আড়ালেই। আসলে হয়েছে কী এই অসমঞ্জ ছিলেন জাতিস্মর। তিনি পূর্বজন্মে ছিলেন এক যোগীপুরুষ। এ জন্মেও তিনি তাঁর যোগসাধনা ও তপস্যা চালিয়ে যেতে চান। কিন্তু রাজার ছেলে রাজপুত্র, কে তাকে যোগসাধনা করতে দেবে। বনবাসে একান্তে তপস্যা করার স্বাধীনতাই বা তাঁর কোথায়। তাঁর উপরে যে রাজ্যশাসনের দুরূহ ভার বর্তমান। তাই তিনি এমন এক চাল চাললেন যাতে পিতা সগর নিজে তাঁকে বনে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর যোগসাধনার পথ সুগম হয়।

কুমার অসমঞ্জ বনে চলে যাবার পরেই যেসব ছেলেকে তিনি জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন সেইসব ছেলে বাড়ি ফিরে আসে। তাই দেখে দেশের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যায় এবং রাজা সগর খুবই অনুতাপ করেন ছেলেকে বনবাসে পাঠানোর জন্য। রাজা সগরের পরে তাঁর পৌত্র অংশুমান অর্থাৎ অসমঞ্জর ছেলে

রাজা হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র রঘু। এই রঘুর নাম অনুসারে বংশের নাম হয় রঘুবংশ। এই রঘুবংশেরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র।

এবার তাকানো যাক সগররাজার ষাট হাজার ছেলের দিকে। একবার রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেই অশ্বমেধের ঘোড়াটি যখন দিগ্‌বিজয়ে বেরোয়, সঙ্গে ছিলেন ষাট হাজার সগরপুত্র। ষাট হাজার লোক কোথাও গেলে যা অবস্থা হয় আর কী, চরিদিকে একেবারে হইহই রইরই কাণ্ড বেঁধে গেল। সগর পুত্ররা আবার ভালো ছেলে বলে খ্যাত ছিলেন না, তাই যা হবার তাই হলো। ষাট হাজার রাজার ছেলে একে ধরছে তাকে মারছে যা ইচ্ছে তাই করছে। লোকজন ভয়েই অস্থির হয়ে গেল। এসব দেখে ওদিকে ইন্দ্রের টনক নড়ল। তিনি ভাবলেন সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের আগেই এত ঝামেলা, না জানি সে যজ্ঞ শেষ হলে এই ছেলেরা কী করবে। স্বর্গই না আক্রমণ করে বসে।

এই ভয়ে তিনি এক ফন্দি আঁটলেন। অশ্বমেধের যজ্ঞঘোড়াকে নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন পাতাললোকে কপিলমুনির আশ্রমে। সগররাজার ছেলেরা ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে পাতাললোকে গিয়ে তপস্যারত মহাতেজা কপিলমুনির আশ্রমে যজ্ঞঘোড়াটিকে দেখতে পেয়ে ভাবলেন মুনিই বুঝি তাদের ঘোড়া চুরি করেছেন। এই ভেবে কপিলমুনিকে তারা বকাবকি করতে লাগলেন। ষাট হাজার লোক চেঁচামেচি করলে কী ভয়ানক ব্যাপার হবে ভাবুন তো। সেই চিৎকারে মুনি চোখ না খুলে যাবেন কোথায়। কিন্তু কে এই কপিলমুনি তা না জানলে পরের গল্প তো বিশ্বাস করা মুশকিল।

প্রজাপতি ব্রহ্মার ছায়া থেকে জন্ম হয় এক মহাতপস্বী কর্দম প্রজাপতির। তাঁর কঠোর তপস্যায় বিষ্ণুর আসন টলে যায়। তিনি স্বয়ং কর্দম মুনির সামনে উপস্থিত হয়ে মুনিকে আশীর্বাদ করে বলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু ও তাঁর স্ত্রী শতরূপার কন্যা দেবাহুতিকে বিবাহ করতে। তাহলে বিষ্ণু স্বয়ং তাঁদের পুত্র হিসেবে জন্ম নেবেন। সেইমতো কর্দমমুনির সঙ্গে দেবাহুতির বিবাহ হয় এবং বিষ্ণু জন্ম নেন তাঁদের পুত্র হয়ে। এই অবতারে বিষ্ণুর নাম হয় কপিল। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার ও পরমজ্ঞানী। তাঁর বোনেরা হলেন কলা, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, খ্যাতি, অনসূয়া, হবির্ভূ, গীতা, অরুন্ধতী ও শান্তি। ওঁদের সঙ্গে বিবাহ হয় বিখ্যাত সপ্তর্ষি নামে খ্যাত মহাঋষিদের (অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরিচি, পুলস্ত, পুলহ ও ক্রতু)।

কপিলমুনি ষড়দর্শনের অন্যতম হিসেবে খ্যাত সাংখ্যদর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা। তিনি মহাতপস্বী। পাতালোকে তিনি তপস্যা করেন। তিনি বিষ্ণুর অবতার। তা এহেন কপিলমুনিকে সগররাজার ছেলেরা চোর বলে বকাবকি করেছে। কপিলমুনি তো চোখ খুললেন। তারপর কী থেকে কী হলো কে জানে, ষাট হাজার ছেলে নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। কপিলমুনির ক্রোধাগ্নি বলে কথা।

সগররাজা সব জানতে পেরে খুব দুঃখ পেলেন। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। তাঁর ছেলেদের পারলৌকিক ক্রিয়াদি হলো না। তাঁদের আত্মার মুক্তি ঘটল না। তাঁরা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একমাত্র স্বর্গধারা গঙ্গার স্পর্শেই তাঁদের মুক্তি হতে পারে।

রাজা সগর মারা গেলেন। সিংহাসনে বসলেন পৌত্র অংশুমান। তারপর অংশুমানের পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র ভগীরথ পরপর রাজা হলেন। ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের এই অবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি কঠোর তপস্যায় বসলেন।

ভগীরথের তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন এবং গঙ্গাদেবীকে আদেশ দিলেন মর্ত্যে আসতে। এমনকী সগররাজার ষাট হাজার ছেলের মুক্তির জন্য পাতালদেশে যেতেও গঙ্গা সম্মত হলেন। কিন্তু গঙ্গা প্রবলবেগে স্বর্গ থেকে পড়লে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। কী করা যাবে? একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবই পারেন গঙ্গার এই প্রবল উচ্ছ্বাস নিজের শিরে ধারণ করতে।

ভগীরথ আবার তপস্যায় বসলেন। এবার শিবকে রাজি করালেন গঙ্গার ধারাকে শিরোধার্য করতে। গঙ্গা স্বর্গ থেকে সোজা শিবের জটায় ঝাঁপ দিলেন। সেই প্রবল জলরাশির তোড়ে পর্বতও টলে যায়, কিন্তু মহাদেব অক্লেশে সেই জলের তোড় সহ্য করলেন। কিন্তু সমস্যা হলো গঙ্গার। তিনি মহাদেবের জটাজালে হারিয়ে গেলেন। অনন্ত কেশরাজির মধ্যে পথ খুঁজে না পেয়ে গঙ্গা অধৈর্য হয়ে পড়লেন। ভগীরথ আবার বসলেন তপস্যায়। এবার শিবকে সন্তুষ্ট করলেন তিনি। শিব দয়া করে জটা থেকে গঙ্গাকে বের করে দিলেন।

ভগীরথের পেছনে পেছনে গঙ্গা চললেন তাঁর বাহন মকরে চেপে চারদিক প্লাবিত করতে করতে। তা গঙ্গা চলুন নাচতে নাচতে। সেই অবসরে আমরা একটু গঙ্গার পরিচয় জেনে নিই।

ব্রহ্মার পুত্র হিমাবত (হিমালয় পর্বত) ও তাঁর পত্নী মেনকার প্রথমা কন্যা হলেন গঙ্গা। তাঁর বোন পার্বতী। তিনি স্বর্গে মন্দাকিনী নামে পরিচিত। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে অসুররা একবার লুকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের একেবারে তলায়। কিছুতেই তাদের খুঁজে না পেয়ে ঋষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন দেবতারা। ঋষি অগস্ত্য জানিয়ে দেন তাঁর পক্ষে সমুদ্রের জল আবার ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেই জল সব তিনি হজম করে ফেলেছেন। শুনে, পৃথিবীবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও মাথায় হাত। শেষে বিষ্ণু তাদের আশ্বস্ত করেন এই বলে যে একদিন গঙ্গা এসে সমুদ্রের জল পূরণ করবেন। তারা যেন সেদিনের অপেক্ষা করেন। গঙ্গাকে আসতেই হবে।

এ কী কাণ্ড! গঙ্গা যে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, পুজোর সব আয়োজন ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। কী হবে এখন! যা ভয় করেছিল তাই হলো। জহ্নুমুনি রেগে গিয়ে এক গণ্ডুষে গঙ্গার সমস্ত জল পান করে ফেললেন। ভগীরথ অনেক কাকুতি মিনতি

করে মুনিকে সন্তুষ্ট করলেন। মুনি রাজি হলেন গঙ্গার জল ফেরত দিতে এবং কান দিয়ে গঙ্গার সমস্ত জল বার করে দিলেন। জহ্নুমুনির শরীর থেকে গঙ্গার জল বার হয়েছিল, তাই গঙ্গা মুনির কন্যাস্বরূপা হলেন। তাই গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী।

গঙ্গা অবশেষে পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে পৌঁছে গেলেন। ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সগররাজার ছেলেদের দেহভস্ম। গঙ্গাজলে সগরপুত্রদের মুক্তিলাভ ঘটল। সমুদ্রে গিয়ে পড়লো সগরপুত্রদের দেহভস্ম। সেই থেকে সমুদ্রের আর এক নাম হলো সাগর। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিশে গেলেন সেই মিলনস্থলের নাম হলো গঙ্গাসাগর। কপিলমুনির আশ্রম ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন গঙ্গা। পাতালের সেই আশ্রম সমুদ্রেই থেকে গেল। চার চারটি মন্দির নিমজ্জিত হলো সমুদ্রের গর্ভে। নতুন মন্দির গড়ে উঠলো নদী মোহনায়। আজ সেখানেই পুজো হয় কপিলমুনির। গঙ্গাসাগরের মেলা হয় মকরসংক্রান্তির পুণ্যস্নানের দিন।

**এক নজরে গঙ্গাসাগরের ইতিহাস**

- ১৮২২ সালে গঙ্গাসাগরে প্রথম রাস্তা নির্মাণ হয়।
- ১৮৫৬ সালে কপিলমুনির প্রথম মন্দির সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যায়।
- ১৮৯৬ যাত্রীদের তীর্থকর ২ আনা ধার্য করা হয়।
- ১৮৯৯ সালে মেলা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস'।
- ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশন সাগরমেলায় সেবা কাজ শুরু করে।
- ১৯১৯ সালে তীর্থকর বাড়িয়ে ৪ আনা করা হয়।
- ১৯২৫ সালে তীর্থকর আরও বেড়ে ৮ আনা হয়।
- ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সাগরমেলা বন্ধ রাখে ইংরেজ সরকার।
- ১৯৫০ সালের ১৩ জানুয়ারি সাগরদ্বীপ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অকল্যান্ড বয়ায় ধাক্কা খেলে কিছু মানুষের সলিল সমাধি হয়। আরও কিছু মানুষ অবশ্য প্রাণে বেঁচে যান।
- ১৯৫৩ সালে তীর্থকর ১ টাকা ধার্য করা হয়।
- ১৯৫৯ সালে মেলায় প্রোট্রোম্যাক্স আলোর ব্যবস্থা করা হয়।
- ১৯৬০ সালে মেলায় বিদ্যুৎ আসে।
- ১৯৬১ সালের ১৫ জানুয়ারি বজবজের অনতিদূরে প্রায় ১২০০ যাত্রী বোঝাই স্টিমার 'শ্যামলী' যান্ত্রিক গোলযোগে মাঝ নদীতে আটকে গেলে যাত্রীদের দুর্ভোগের শিকার হতে হয়।
- ১৯৬২ সালে সাগরমেলা থেকে

ট্রাঙ্ক টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়।

● ১৯৬২ সালের ১১ জানুয়ারি গভীর রাতে সাগরের পথে ৯০ জন যাত্রী নিয়ে একটি দেশি নৌকা ডায়মন্ড হারবার থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে হাড়ামুকুন্দপুরে স্টিমারের ধাক্কায় ডুবে গেলে ১৫ জন পুণ্যর্থীর মৃত্যু হয়।

● ১৯৬৪ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক মেলার দায়িত্ব নেন। সেই বছরেই আচার্য বিনোবাভাবে গঙ্গাসাগরে আসেন এবং তীর্থকর রদ হয়।

● ১৯৭০ সালে গঙ্গাসাগরের অনতিদূরে বঙ্গোপসাগরে লঞ্চ ডুবি হয়। 'জয়' নামে এই লঞ্চ দুর্ঘটনায় চার শতাধিক যাত্রীর সলিল সমাধি হয়। ওই বছরই মেলা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে সাতবেকি নদীর মোহনায় একটি যাত্রী বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হয়। এতে বহু মানুষ নিখোঁজ হন।

● ১৯৭২ সালে রুদ্রনগরে স্থায়ী জেনারেটরের মাধ্যমে মেলায় বৈদ্যুতিকীকরণ হয়।

● ১৯৭৩ সালে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে কপিলমুনির মন্দির নিমজ্জিত হয়। অযোধ্যার হনুমান গড়ির মহন্ত কর্তৃক নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়।

● ১৯৭৬ সালে মেলার তীর্থকর হয় ২ টাকা।

● ১৯৭৭ সালে মেলার উন্নয়নে মেলা কর ধার্য করা হয়।

● ১৯৮০ সালে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সাগরমেলায় আসেন।

● ১৯৮৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপে মেলার দায়িত্ব নেয় রাজ্য সরকার। যুব আবাস, জেলাশাসক এবং জেলা পরিষদের বাংলোর উদ্বোধন করেন জ্যোতি বসু।

● ১৯৮৬ সালে মেলায় প্রথম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। ফলে শতাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়। যদিও সরকারি হিসেবে সংখ্যাটা ২৩। সে বছর নৌকাডুবি, ভটভটি, বাস দুর্ঘটনায় প্রচুর প্রাণহানি হয়।

● ১৯৮৭ সালে গঙ্গাসাগরে প্রশস্ত বাসস্ট্যান্ড এবং চার নম্বর রাস্তা নির্মিত হয়।

● ১৯৮৮ সালে স্থায়ী মেলা অফিসের উদ্বোধন হয়।

● ১৯৮০ সালে কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮-এ নতুন জেটি এবং রাম্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সাধু নিবাসে অগ্নিকাণ্ড এবং বামুনখালিতে বাস দুর্ঘটনা হয়। তীর্থযাত্রীদের নিয়ে আসা একটি নৌকা বকখালির কাছে ডুবে গেলে ১৬ জনের মৃত্যু হয়। কাঁকড়ামারির চরে একটি যন্ত্রচলিত নৌকা উলটে গেলে একজনের মৃত্যু হয়।

● ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতি রামাস্বামী বেঙ্কটরমণ গঙ্গাসাগরে আসেন।

● ১৯৯৪ সালের ১৪ জানুয়ারি গভীর রাতে চেমাগুড়ি থেকে নামখানা যাবার পথে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই 'মা অভয়া 'লঞ্চ মুড়িগঙ্গা বা বটতলা নদীতে 'সাগর সম্রাট' লঞ্চের ধাক্কায় ডুবে যায়। ১৯৬ জন তীর্থযাত্রীর সলিল সমাধি হয়। এর মধ্যে মাত্র ১৩ জন যাত্রীর পরিচয় জানা যায়। এই দুর্ঘটনার তদন্তে রাজ্য সরকার মণ্ডল কমিশন গঠন করে।

● ১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারি সকালে মায়াগোয়ালিনী ঘাটের কাছে যাত্রীবাহী ট্রলার উলটে যায়। স্থানীয় মানুষ এবং মৎস্যজীবীদের চেষ্টায় ৭০ জন তীর্থযাত্রীকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়।

● ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাসাগরে আগমন।

● ১৯৯৭ সালে গঙ্গাসাগরে মহাপ্রভু শ্রীশ্রী বল্লভাচার্যের ৩১ তম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

● ১৯৯৯ সালে ভেসেল ও বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তীর্থযাত্রীরা। মেলায় লোক হয় মাত্র সোয়া ২ লক্ষ।

● ২০০০ সালে লোকাল বাসের সংখ্যা কমিয়ে সরকারি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

● ২০০১ সালে কলকাতার বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির অস্থায়ী অতিথিশালায় অগ্নিকাণ্ড হয়।

● ২০০২ সালে অগ্নি নির্বাপণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়।

● ২০০৩ সালে পরিবহণ ভাড়া বৃদ্ধি হয়।

● ২০০৪ সালে মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি কাটানোর কাজ শুরু হয়।

●২০০৬ সালে রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম সাগরদ্বীপে আসেন।

● ২০১০ সালে লট নম্বর ৮-এ লঞ্চে উঠতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে ৭ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল দেবানন্দ কুঁয়ার সাগরদ্বীপে আসেন।

● ২০১২ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগরে এসে এক গুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করেন।

● ২০১৪ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে কপিলমুনির মন্দির সংস্কারের জন্য শিলান্যাস করেন। সাগর সৈকতের নাম দেন 'ঢেউ সাগর'।

● ২০১৭ সালে তীর্থ করে ফেরার পথে কচুবেড়িয়ায় পদপিষ্ট হয়ে এবং জলযান থেকে পড়ে অন্তত ২০ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। বছর শেষে সাগর মেলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে 'গঙ্গাসাগর মেলাকে 'জাতীয় মেলা'র স্বীকৃতি দাবি করেন। মুড়িগঙ্গা নদীর ওপরে সেতু নির্মাণের আশ্বাস দেন।

● ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সাগরদ্বীপের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে গঙ্গাসাগরেই বৈঠক করেন।

● ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাগর মেলার উদ্বোধন করেন এবং দুটি রাত যাপন করেন।

● ২০২১ সালের ২৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দেন।

● ২০২৩ সালে ৮ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষের ভিড় হয়। প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে। এই প্রথম সাগরমেলায় তিনদিন ধরে গঙ্গাআরতি হয়।

□

# অমর্ত্য সেন নোবেল লরিয়েট নন

**সমর সরকার**

অমর্ত্য সেন একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়েও রাজনৈতিক নেতাদের মতো ব্যবহার করেন কীসের স্বার্থে? নোবেল পুরস্কার সারা পৃথিবীর উচ্চ মর্যাদাবহ সম্মান আমরা জানি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাদার টেরেসা, সিভি রমন, প্রমুখ মহৎ ব্যক্তিগণ নোবেল সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যে সমস্ত মহৎ ব্যক্তি নোবেল সম্মানে ভূষিত হন তাদের নোবেল লরিয়েট বলা হয়।

আজকের আলোচ্য অধ্যাপক অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন? মিস্টার সেনকে কি নোবেল লরিয়েট বলা যাবে? কিছুদিন আগে টেলিভিশন, ফেসবুক, সংবাদপত্র, টুইটার ইত্যাদি মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে আলোড়ন ফেলেছিল যে খবরটি, তা হলো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেছিলেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পাননি। তিনি নোবেল লরিয়েট নন। চক্রবর্তী কি ভুল বললেন? হুড়োহুড়ো লেগে গেল ইতিহাস জানার চেষ্টায়। বিজ্ঞানী নোবেলের ১৮৯৫ সালে করে যাওয়া একটি উইলের মর্মানুসারে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারের প্রচলন। বিজ্ঞানী নোবেল মৃত্যুর পূর্বে উইলের মাধ্যমে এই পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করে যান। পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সফল এবং অনন্য সাধারণ গবেষণা ও উদ্ভাবনা এবং মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এই পুরস্কার। বিজ্ঞানির উইলে স্পষ্ট বলা আছে পাঁচটি বিষয়ে পুরস্কার প্রদানের কথা। ১. পদার্থবিজ্ঞান, ২. রসায়ন বিজ্ঞান, ৩. চিকিৎসাশাস্ত্র, ৪. সাহিত্য ও ৫. শান্তি।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বলে প্রচলিত আসলে তা বিজ্ঞানী নোবেলের উইলের বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। ১৯৬৮ সালে সুইডিস কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ৩০০ বছর পূর্তিতে নোবেল ফাউন্ডেশনকে একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ দান করে এবং বলা হয় একটি নতুন বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করার কাজে ব্যবহৃত হবে এই অর্থ, যেটি হলো অর্থনীতি। এই বিষয়ে পুরস্কার মনোনীত করার দায়িত্ব পড়ে রয়াল সুইডিশ সায়েন্স অ্যাকাডেমির উপর।

জান টিন বার্গেন ও রাঙ্গার ফিস্ হলেন অর্থনীতিতে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী যদিও এই পুরস্কার নোবেল পুরস্কার নয়, তথাপি সুইডিশ নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠানে অন্যান্য পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়।

অর্থনীতির নোবেল পুরস্কারের আসল নাম— 'The Sveriges Riskbank Prize in Economic Science in Memory of Alfred Nobel' এই পুরস্কার প্রদান করে Sveriges Riksbank, এই ব্যাংক হলো সুইডেনের সবচেয়ে বড়ো এবং পুরনো ব্যাংক।

সূত্র মারফত নোবেল কমিটি থেকে জানা গেছে যে, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন নোবেল লরিয়েট নন। এছাড়া এও জানা যায় যে নোবেল প্রাইজে মনোনীত প্রার্থীদের মঞ্চে যখন ডাকা হয় তখন ঘোষণা করা হয়— step forward and recieve your Nobel Prize from the hands of His/Her magistrate...। অর্থনীতিতে মনোনীত প্রার্থীদের মঞ্চে যখন ডাকা হয় তখন বলা হয়— step forward and take your price from the hands of His/Her magistrate...।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই অর্থনীতির প্রাইজটি বিজ্ঞানী নোবেলের করে যাওয়া ইউলের মধ্যে পড়ে না, অর্থাৎ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন নোবেল লরিয়েট নন।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ২০০৭ সালে নালন্দা মেন্টর গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০১২ সালে ইউপিএ-২-এর আমলে বিহারের বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের (NU) প্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। এই সময়ে অধ্যাপক সেনের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তিকর প্রশ্ন ওঠে। তিনি নাকি চারটি মহিলা অনুষদ (বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সদস্য) নিয়োগ করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন উপেন্দর সিংহ এবং বাকি তিনজন ছিলেন উপেন্দরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উপেন্দর হচ্ছেন মনমোহন সিংহের বড়ো মেয়ে। জৈনের (Bharti Jain) উপস্থাপিত করা অভিযোগগুলোর মধ্যে এটি একটি। জৈন হলেন টাইমস অব ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পাদক। জৈনের বক্তব্য অনুযায়ী অধ্যাপক সেনের সময় কিছু অর্থনৈতিক দুর্নীতির ব্যাপারও সামনে আসে। অধ্যাপক সেন ১৮ জুলাই ২০১২, তিন বছরের জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২০১৫ সালের জুলাইয়ে তার মেয়াদ শেষ হয়। এরপর তিনি আর নিজে থেকেই থাকতে চাননি, অথচ তিনি দোষ দেন মোদী সরকারের। তিনি সদ্য নির্বাচিত হওয়া এনডিএ সরকার বা মোদী সরকারের সমালোচনায় মুখরিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এনডিএ সরকার এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কতটা খারাপ আচরণ করেছে তা দেখে আমি বিচলিত। অথচ এনডিএ সরকার কী খারাপ আচরণ করেছেন তার কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি। এরপর ক্রমাগত এনডিএ সরকারের অর্থনীতি অ্যাজেন্ডা নিয়ে নানা রকম সমালোচনা শুরু করেছিলেন। এর আসল কারণ কি তার ব্যক্তিস্বার্থ নয়?

এত গেল পুরস্কারের তুল্যমূল্য ও অন্যান্য বিষয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাদার টেরেসা প্রমুখ নোবেল লরিয়েটদের ভারতবর্ষে তাদের করে যাওয়া কৃতিত্ব ও অবদান সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত। অধ্যাপক সেন এবং অধ্যাপক অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জির ভারতবর্ষের বুকে তাঁদের সামাজিক কোনো কাজকর্ম পরিলক্ষিত নয়।

অধ্যাপক অর্মত্য সেন নিজের ব্যক্তিস্বার্থ এবং কিছু সম্পত্তির জন্য বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে কিছু বাক্য প্রলাপ বকছেন যা মোটেই শ্রুতিগ্রাহ্য নয়।

# শ্যামাপ্রসাদের হস্তক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম

**উত্তম মণ্ডল**

ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ভারতের চেপে রাখা ইতিহাস। আজকের পর্বে সেই চেপে রাখা ইতিহাসের কিছু ঘটনার কথা। অবশ্য ইতিহাস তো ঘটনাই। আজকের পর্বের শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল

১৯৪১ সালে বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পাল্টে সাবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যান গান্ধীও। গান্ধী মানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত জেনে 'ভারত ছাড়ো' দাবি থেকে সরে এসে ব্রিটিশকেই সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন গান্ধী।

এরপর স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি চেয়ে চিঠি লিখলেন বড়লাটকে। এ সময় কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী গান্ধীর অনুমতি সাপেক্ষে 'পাকিস্তান' মেনে নিয়ে জিন্নার সঙ্গে আপোশ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ বড়লাট গান্ধীর চিঠির উত্তরে জানিয়ে দিলেন, এ প্রস্তাব গ্রহণ করা তো দূরের কথা, এটি আলোচনার যোগ্যও নয়।

এরপর গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের সুরেই সুর মেলান। শেষপর্যন্ত ভারত বিভাগ প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটি হয়। ১৫৭-২৯ ভোটে গৃহীত হয় দেশভাগের প্রস্তাব। ভোটদানে বিরত থাকেন ৩২ জন প্রতিনিধি। তবে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ভারত ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করলেও হিন্দু মহাসভা তা গ্রহণ করেনি।

যাই হোক, দেশভাগ নিয়ে কংগ্রেস মুসলিম লিগ একমত হবার পরেও বাঙ্গলা ও পঞ্জাব নিয়ে নতুন এক সমস্যা দেখা দেয়। বাঙ্গলা ও পঞ্জাবকে প্রথম থেকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছেন জিন্না। ভারতে ক্যাবিনেট মিশন আসার পর ফের এই দাবি তোলে মুসলিম লিগ। এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় হিন্দুদের মধ্যে। মাত্র এক বছর আগে সুরাবর্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগ সরকারের শাসন, কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও নোয়াখালি দাঙ্গার ভয়ংকর স্মৃতি থেকে হিন্দুদের এই প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক।

এরপর 'কলকাতা হাইকোর্টের ৫০ জন ব্যারিস্টার বঙ্গ বিভাগের দাবি জানাইয়া এবং তার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি দুটি। প্রথমত, তাহারা বলেন, পাকিস্তানে আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা এক দাসত্বের বিনিময়ে অন্য দাসত্ব চাই

না। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা হইবে।'

— বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৪, রমেশচন্দ্র মজুমদার।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি তৃতীয় প্রস্তাব করা হয় এবং সেখানে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাঙ্গলার দাবি ওঠে। এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা সুরাবর্দি নিজেই। এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুরাবর্দি আবেগপূর্ণ ভাষায় হিন্দুদের মন জয় করতে চেয়ে বলেন, 'আমি অঙ্গীকার করিতেছি, ভবিষ্যৎ বর্তমানের ন্যায় হইবে না, হিন্দুগণ পূর্বের কথা ভুলিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আমি তাহাদের আশা ও দাবি পুরোপুরি মিটাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিতেছি। বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরব ও ঐশ্বর্য্য আবার ফিরিয়া আসিবে।' এই প্রস্তাবে আন্তরিক সমর্থন ছিল শরৎচন্দ্র বসুর। এছাড়া এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান ডা: বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায়। তবে হিন্দুরা আর বিভ্রান্ত হলো না। দেশভাগ স্থির হবার আগেই ১৯৪৭ সালের ১৯ মার্চ বঙ্গপ্রদেশকে ভাগ করে দুই স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি জানান ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর ফলে সুরাবর্দির স্বতন্ত্র স্বাধীন বাঙ্গলা গড়ার স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়ে। সুরাবর্দির স্বতন্ত্র স্বাধীন বাঙ্গলা গড়ার তীব্র বিরোধিতা করে ড: শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গলাদেশের হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। ১৯৪৭ সালে বাঙ্গলাদেসে হিন্দু ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ এবং মুসলমান ছিল ৫৬ শতাংশ। তাই বাঙ্গলাকে ভাগ না করা হলে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই অবস্থায় বিপদ থেকে হিন্দুদের রক্ষার জন্য বাঙ্গলা ভাগের প্রস্তাব করেন ড: বি আর আম্বেদকর। তিনি জানাচ্ছেন—

"..To redraw the boundaries, to have Muslims and Hindus placed under saparate National States and thus rescue the 44 P.C. of the Hindus from the Horrors of the Muslim Rule?" - Writtings and Speeches, Vo,l.8, page 125, Dr. B.R. Ambedkar.

এরপর বাঙ্গলার মুসলিম নেতারা এবং হিন্দুদের তরফে শরৎচন্দ্র বসু, ডা: বিধানচন্দ্র রায় এবং বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য কিরণ শংকর রায় বিষয়টি নিয়ে গান্ধীর মাধ্যমে দিল্লিতে সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর একদিন সুরাবর্দি, শরৎচন্দ্র ও বাঙ্গলার মুসলিম লিগ সেক্রেটারি আবুল হাসেমকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করলেন গান্ধী সঙ্গে। আবুল হাসেম আবেগের সঙ্গে গান্ধীকে জানান, 'ভাষা, সংস্কৃতি ও অতীত ইতিহাস বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের চিরস্থায়ী বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই আমরা বাঙ্গালি, সুতরাং হাজার মাইল দূর হইতে পাকিস্তান আমাদের শাসন করিবে ইহা ঘৃণার বিষয়।'

খুশি হইয়া গান্ধীজী হাসেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা যদি পাকিস্তান ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য স্বাধীন বঙ্গদেশকে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের সহিত যুক্তরাজ্য গঠনের জন্য আহ্বান করে, তবে কি স্বাধীন বঙ্গদেশ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে।'

হাসেম হাঁ বা না কোনো উত্তর দিলেন না। চুপ করে রইলেন। গান্ধীজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যে বাঙ্গালির সংস্কৃতির কথা বলিলেন, তাহার মূল উৎস উপনিষদে এবং বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহাকে মূর্ত করিয়াছেন তাহা কেবল বঙ্গদেশের নহে, সর্বভারতীয় সংস্কৃতি, সুতরাং স্বাধীন অখণ্ড বঙ্গদেশ কি ভারতের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান গ্রহণ করিবে।'

এবারেও হাসেম চুপ করে থাকলেন। কিন্তু সুরাবর্দি সম্মতি দিয়েছিলেন।

— বাংলাদেশের ইতিহা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৫০, রমেশচন্দ্র মজুমদার।

যাই হোক, শ্যামাপ্রসাদের বলিষ্ঠ বিরোধিতা এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, নেহরু ও জিন্নার আপত্তির কারণে শেষপর্যন্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র বাঙ্গলা আর গড়ে উঠল না। এরপর ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলিম যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদানের প্রস্তাব বিপুল ভোটে গ্রহণ করেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন গান্ধীবাদী নেতা বলে পরিচিত ড: প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। □

# বিকল্প জ্বালানির উৎপাদন বাড়াতে সবুজ উন্নয়নে জোর 'সপ্তঋষি' বাজেটে

**অমিত মাজি**

২০২৩-২৪ কেন্দ্রীয় বাজেটে যে সাতটি বিষয়কে (সপ্তঋষি) প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 'সবুজ উন্নয়ন' অন্যতম। বাজেট পরবর্তী ১২টি ওয়েবিনারের মধ্যে প্রথম ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হলো এই সবুজ উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে। মূল বক্তা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে সে সমস্ত উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র সরকার তার কার্যকর রূপায়ণের জন্য পরামর্শ চাইতে সরকারি উদ্যোগে এই ওয়েবিনারগুলির আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের আয়োজনে প্রথম ওয়েবিনারটিতে সবুজ উন্নয়নের বিষয়ে অধিবেশন বসে। বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি প্রতিনিধি, শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্টজনেরা এই ওয়েবিনারে অংশ নেন। প্রথম ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সবুজ উন্নয়ন' প্রসঙ্গে বক্তৃতা রাখেন। তিনি বলেন, ''২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত যে ক'টি বাজেট পেশ করা হয়েছে প্রতিটিতেই বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সংস্কারের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।''

'সবুজ উন্নয়ন'-এর জন্য প্রধানমন্ত্রী তিনটি মূল স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমটি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়টি জৈব জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং সর্বশেষ, দেশে যত দ্রুত সম্ভব গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে পরিবর্তিত হওয়া।

এই প্রকল্পগুলি ইথানল ব্লেন্ডিং-এর মতো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হয়েছে। 'পিএম কুসুম' যোজনা, সৌরক্ষেত্রে উৎপাদন, বাড়ির ছাদে সৌর প্রকল্প এবং ব্যাটারি সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলি বিগত কয়েক বছর ধরে বাজেটে প্রাধান্য পাচ্ছে। বিগত বছরের বাজেটে অন্যতম বিশেষ ঘোষণার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের জন্য 'পিএম প্রণাম' যোজনা, শহরগুলির যানবাহন বাতিল নীতি, 'গোবর্ধন' যোজনা এবং সবুজ হাইড্রোজেন ও জলা জমি সংরক্ষণের বিষয়গুলি এবারের বাজেটেও বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের বিশেষ অবদান রয়েছে। ''এবারের বাজেট আন্তর্জাতিক সবুজ শক্তি বাজারে ভারতকে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। সেজন্য আমি আজ শক্তিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভারতে বিনিয়োগে আহ্বান জানাই''-বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষজ্ঞদের মতে এবারের বাজেট প্রত্যেক সবুজ শক্তির বিনিয়োগকারীকে ভারতে বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে। যার ফলে, এই ক্ষেত্রের স্টার্টআপগুলিও বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,২০১৪-র পর থেকে মূল অর্থনীতিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে ভারত বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন তথ্য সমীক্ষা করে দেখা যায় যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ভারত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারছে। ইতিমধ্যে অজীবাশ্ম জ্বালানিক্ষেত্রে ভারত ৪০ শতাংশ অবদান রাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এবং তা

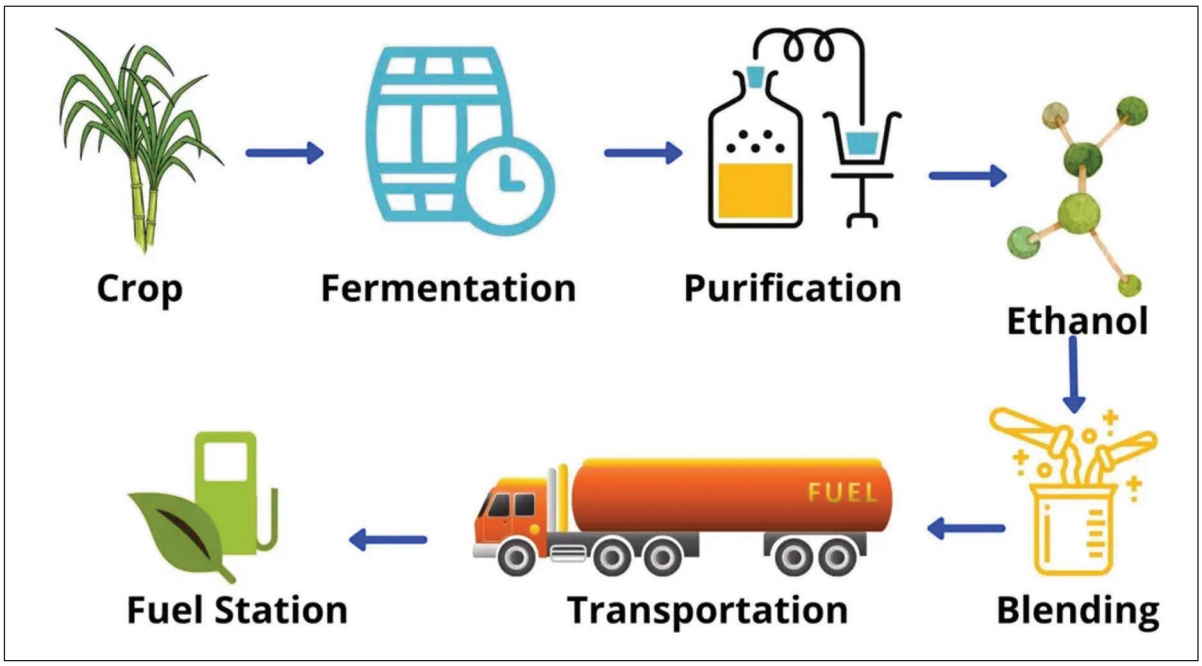


সম্ভব হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের ৯ বছর আগেই। নির্ধারিত সময়ের পাঁচমাস আগেই ভারত ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ সালের মধ্যেই ভারত পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণে সক্ষম হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করবে ভারত। ই-২০ জ্বালানি চালুর কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,সরকার জৈব জ্বালানি ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। সৌর, বায়ু ও বায়ো-গ্যাসের ব্যবহার ভারতে স্বর্ণ খনি বা তৈলক্ষেত্রের তুলনায় কোনও অংশেই কম নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্যে জানানো হয়েছে, জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশনের আওতায় ভারত ৫ এমএমটি হাইড্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্যপূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯ হাজার কোটি টাকা। গোবর থেকে ভারতের ১০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার বায়ো গ্যাস তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া দেড় লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস দেশে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ অবদান রাখতে পারে। এই সম্ভাবনার দিকে নজর রেখেই এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার 'গোবর্ধন' যোজনার আওতায় ৫০০ টি নতুন কারখানা স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছে। তবে এগুলির কোনওটাই পুরনো ধাঁচের কারখানা নয়।

সরকার এই অত্যাধুনিক কারখানাগুলি গড়ে তুলতে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্য এবং বাড়ি-ঘরের বর্জ্য থেকে সিবিজি উৎপাদনের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিকে আকর্ষণীয় অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

ওয়েবিনারের বক্তৃতায় ভারতে যানবাহন বাতিল নীতির দিকে আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সবুজ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' তিনি বলেন, এবারের বাজেটে সরকার ৩ লক্ষের বেশি যানবাহন বাতিল করার জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে। এই যানবাহনগুলি পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স ও বাস ছাড়াও কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার অধিকৃত এবং ১৫ বছরের পুরনো। যানবাহন বাতিলের বাজার ক্রমশ উন্নত হতে চলেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, আগামী ৬-৭ বছরে ব্যাটারি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঘণ্টায় ১২৫ গিগাওয়াটে নিয়ে যাবে ভারত। ব্যাটারি প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করতে সরকার এক বিশেষ প্রকল্প নিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী জলভিত্তিক যানবাহন ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন। সূত্রের খবর অন্তর্দেশীয় জলপথের মাধ্যমে দেশের ২ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করা হয়। ভারতের জলপথগুলির উন্নয়ন এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে। বক্তব্যের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''ভারতের সাম্প্রতিক বাজেট কেবলমাত্র সম্ভাবনা নয়, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণও বটে''। সবশেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের বাজেটের সম্ভাব্য সব দিকগুলো যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানান নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, 'সরকার আপনাদের সঙ্গে রয়েছে, আপনারা আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ দিন।' □

# এইচআইভি পজিটিভ শিশুদের অবলম্বন মহারাষ্ট্রের মঙ্গলতাই

**বিশেষ প্রতিনিধি॥** ২০০১ সালের মার্চ মাসের একদুপুর। অন্যদিনের মতো সেদিনও কন্যা ডিম্পলকে নিয়ে মহারাষ্ট্রের পন্ধারপুরে যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস্ সচেনতার প্রচারে বেরিয়ে ছিলেন মঙ্গল অরুণ শাহ। স্থানীয় লোকজনের কাছে খবর পেলেন কাছের একটি গ্রামে, একটা আড়াই বছরের ও আরেকটা দেড় বছরের শিশুকে কারা যেন পরিত্যক্ত গোয়ালঘরে ফেলে রেখে গেছে।

খবরটা শোনামাত্র ওই গ্রামে ছুটে গিয়েছিলেন মঙ্গলতাই। শিশুদুটোর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানলেন তারা দুজনে একই মায়ের সন্তান। তাদের বাবা-মা দুজনেই মারণরোগ এইডস্-এ আক্রান্ত ছিলেন। দুজনেই মারা গেছেন। শুধু তাই নয়, ওই দুটি পরিত্যক্ত শিশুও এইচআইভি পজিটিভ। তাদের আত্মীয়-পরিজনেরা শিশুদুটিকে গোয়ালঘরে ফেলে রেখে গেছে। পরিজনেরা মনে করেন, এই শিশুদুটি থেকে অন্য সদস্যরাও মারণরোগে আক্রান্ত হতে পারে।

শিশুদুটির দুর্দশা দেখে ব্যথিত হলেন মঙ্গলতাই। গ্রামের অন্য সদস্যদের তিনি অনুরোধ করলেন বাচ্চাদুটোর দেখাশোনা করতে, কিন্তু সবাই তাঁকে ফিরিয়ে দিল। তখন মঙ্গলতাই ও ডিম্পল শিশুদুটিকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক হলো, এর মধ্যে তাঁরা এইচআইভি পজিটিভ শিশুদের অনাথাশ্রমের খোঁজ পেলে শিশুদুটিকে সেখানেই রাখবেন। বাবা-মা হারানো শিশুদুটি মঙ্গলতাইয়ের বাড়িতে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু মঙ্গলতাই অনেক খুঁজেও তাঁদের সোলাপুর জেলায় সেরকম কোনও অনাথালয় খুঁজে পেলেন না। এমনকী পুরো মহারাষ্ট্র রাজ্যের কোথাও এইচআইভি পজিটিভ শিশুদের অনাথাশ্রম নেই!

মঙ্গলতাই ও ডিম্পল সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেদের বাড়িতেই শিশুদুটিকে রেখে তাঁদের দেখাশোনা করবেন। মঙ্গলতাই জানান, ''সিদ্ধান্তটা খুব কঠিন ছিল। কারণ আমার পরিবারও এইসব বিষয়ে যথেষ্ট রক্ষণশীল। প্রথমদিকে তাদের ভয় ছিল, বিষয়টাকে সমাজ কীভাবে দেখবে। একঘরে করে দেওয়ারও একটা

দুশ্চিন্তা কাজ করছিল। কারণ আজও আমাদের সমাজে এইচআইভি পজিটিভদের ব্রাত্য করে রাখা হয়। ধীরে ধীরে আমার পরিবারের সদস্যরা বুঝতে শুরু করল, যে আমি কোনও বাধাতেই পিছু হঠব না। আমার স্বামী, আমার সন্তানরা আমার পাশে দাঁড়িয়েছে বলেই আজ পরিত্যক্ত শিশুগুলো তাঁদের অধিকার নিয়ে বেঁচে আছে।'' আজ মঙ্গলতাই ও ডিম্পল একটি 'কেয়ার হোম' গড়ে তুলেছেন। যেখানে ১২৫ জন এইচআইভি পজিটিভ ৬৯ বছর বয়সি মঙ্গলতাইয়ের স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের বয়েস ৪ থেকে ২১-এর মধ্যে। পন্ধারপুরের টাকলি গ্রামের কাছেই অলাভজনক সংস্থা 'প্রভা হীরা প্রতিষ্ঠান' ও 'পলাওয়ি' গড়ে এইচআইভি পজিটিভদের দেখাশোনা করছেন মঙ্গলতাই ও ডিম্পলরা। মারাঠি ভাষায় পলাওয়ি শব্দের অর্থ নতুন পাতা।

সোলাপুর জেলার বারশি'তে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম মঙ্গল অরুণ শাহের। তাঁর বাবা-মা ছিলেন কৃষিজীবী। মাত্র ১৬ বছর বয়সে মঙ্গলের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। তবে সংসার ধর্মের পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দ, বাবা আমটের অনুপ্রেরণায় সমাজসেবার কাজ শুরু করেন তিনি। ছোট থেকেই তাঁদের সম্পর্কে অসংখ্য বই পড়ে ফেলেছিলেন মঙ্গল। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রেরণা জোগান তাঁর মা। সেই মঙ্গল অরুণ শাহকে আজ পুরো মহারাষ্ট্র এক ডাকে চেনে মঙ্গলতাই নামে। তাঁর সেবাকাজের আদর্শ ও প্রেরণার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে মেয়ে ডিম্পলের মধ্যে। ডিম্পলের যখন ১০ বছর বয়েস, তখন থেকেই তাকে সঙ্গে করে বিভিন্ন কুষ্ঠ রোগ প্রতিষ্ঠান, অনাথাশ্রম, সরকারি হোমে নিয়ে যান মঙ্গলতাই। ডিম্পল সেখানে একজন স্বেচ্ছাসেবীর মতোই কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করা, অনাথ শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাঁদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করার মতো কাজগুলি করে। মঙ্গলতাই একটি স্যুপ কিচেনও খুলেছেন। ডিম্পল তাঁর সহযোগী। সহায় সম্বলহীন মহিলা, ভবঘুরে, যৌনকর্মী এবং বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা এইডস্ রোগীদের খাবার পৌঁছে দেয় ডিম্পল। তাঁর কথায়, 'ছোট থেকে মা'কে দেখেছি নিঃস্বার্থভাবে অসহায় মানুষদের সাহায্য করতেন। রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষের ক্ষতস্থান নিজের হাতে পরিষ্কার করে দিতেন। ভাবতাম কীভাবে মা এসব করেন, যখন অন্য সবাই ঘেন্নায় পথ এড়িয়ে চলে যায়? মাকে প্রশ্ন করতে আমায় স্বামী বিবেকানন্দ ও বাবা আমটের ওপর অনেকগুলো বই পড়তে দিলেন। সেগুলো শেষ করার পর আমি মা'কে কোনও প্রশ্ন করিনি। শুধু বলেছিলাম, আমার পড়া না থাকলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

সমাজ যাদের ব্রাত্য করে দিয়েছে, তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকার ফিরিয়ে দিতে রাতদিন এক করে দিচ্ছেন মঙ্গলতাই। সঙ্গে মেয়ে ডিম্পল। পরিবারের সংস্কার যে মানুষকে আলোর পথে চালিত করে তার যথাযথ দৃষ্টান্ত হলো এই মা-মেয়ে। □

# নবজন্ম

এক চোর রাজবাড়িতে চুরি করে পালিয়েছে। রাজার সিপাই সান্ত্রীরা চোরের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। চোর খুঁজতে খুঁজতে তারা চোরের পায়ের দাগ দেখতে পেল। সেই দাগ অনুসরণ করতে করতে তারা চোরের পিছু নিল। তারা দেখল চোরের পায়ের চিহ্ন

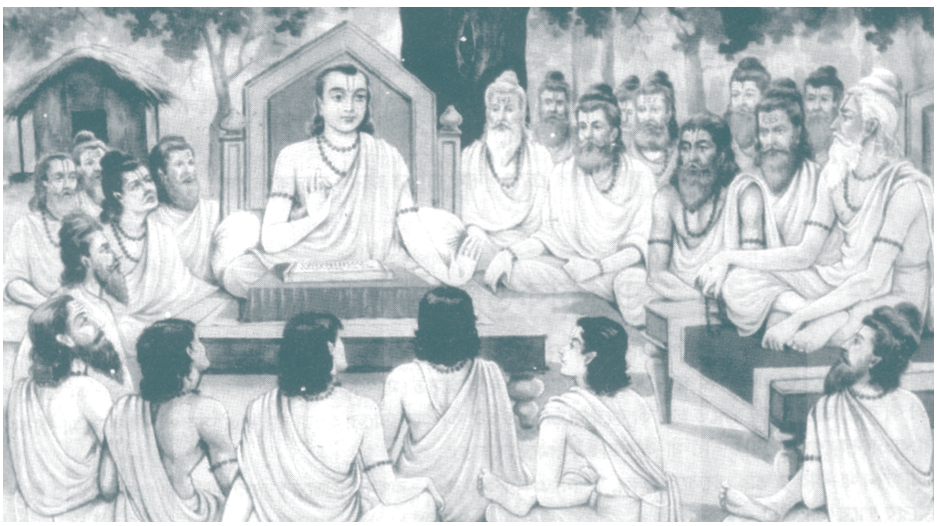

গ্রামের দিকে গেছে। সিপাইরা চিন্তা করল চোর নিশ্চয় গ্রামের মধ্যেই আছে। কেননা গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসার পায়ের ছাপ দেখতে পেল না। তারা গ্রামের চারপাশে বেশ করে খুঁজে গ্রামের ভেতর ঢুকে দেখল সেখানে ধর্মকথার আসর বসেছে। তারা ভাবল চোর নিশ্চয় ওখানে চুপটি মেরে বসে আছে। সিপাইরা আসর ঘিরে ফেলে চোর ধরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সেখানে একজন সন্ন্যাসী ধর্মকথা শোনাচ্ছিলেন। সকলেই শুনছে। সেই চোরও সেখানে বসে পড়েছে। সন্ন্যাসী বলছেন, যে লোক সরল মনে ভগবানের শরণ নেয় ভগবান তার সব পাপ ক্ষমা করে দেন। ভগবান নিজেই বলেছেন, পাপ চিন্তা, পাপ কর্ম ত্যাগ করে যে আমার শরণাপন্ন হয় আমি তাকে সবরকম পাপ থেকে মুক্ত করি। যে একবার আমার শরণাগত হয়ে 'আমি তোমার' বলে পরিত্রাণ চায় তাকে আমি ভবিষ্যতের সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত করি। যে নিজেকে ভগবানের কাছে সঁপেছে, মনে করতে হবে তার নবজন্ম হয়েছে। তখন সে আর পাপী নয়, সাধু।

চোর সব শুনল এবং ওখানেই বসে বসে মনস্থির করল, আমি ভগবানের শরণ নিচ্ছি। এখন থেকে আমি আর চুরি করব না। আমি ভগবানের হয়ে গেলাম।

ধর্মকথার আসর শেষ হলো। লোকজন চলে যেতে লাগল। বাইরে রাজার সিপাইরা সবার পায়ের চিহ্ন দেখছিল। চোর বাইরে আসতেই তার পায়ের চিহ্ন দেখে তাকে ধরে ফেলল। তারপর রাজার কাছে হাজির করল। রাজা চোরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রাজবাড়িতে চুরি করেছিলে? জিনিসগুলো কোথায় রেখেছ? চোর বিনীতবাবে বলল, রাজামশাই, আমি চোর নই। এজন্মে আমি কখনো চুরি করিনি। সিপাইরা বলল, মহারাজ, এ মিথ্যা কথা বলছে, আমরা তার পায়ের চিহ্ন দেখেই তাকে ধরেছি। রাজা তখন চোরের কথা সত্যি কিনা পরীক্ষা করার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। মন্ত্রীর হুকুমে চোরের হাতের তালুতে আগুনে লাল করে তাতানো একখণ্ড লোহা চাপিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু কী আশ্চর্য! চোরের হাত তাতে পুড়ল না আর লোহাটা যেখানে ফেলা হলো সেখানটা পুড়ে কালো হয়ে গেল।

রাজা দেখলেন, বাস্তবিক এ চুরি করেনি। ভুল লোককে ধরে আনার জন্য তিনি রেগে গিয়ে সিপাইদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। একথা শুনে চোর বলে উঠল, না মহারাজ, ওদের কোনো দোষ নাই। চুরি আমিই করেছিলাম। রাজা তখন ভাবলেন যে এ একজন সাধুপুরুষ। সিপাইদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চুরির দায় নিজের ওপর নিচ্ছে। চোর বলল, মহারাজ, সত্যিই আমি চুরি করেছি আর জিনিসগুলি জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। চোরের কথামতো রাজামশাই তখন জঙ্গলে লোক পাঠালেন। তারা চুরি করা সেই জিনিসপত্র নিয়ে এল। রাজা তাই দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুমি চুরি করেছিলে কিন্তু আগুনে তোমার হাত পুড়ল না কেন?

চোর বলল, মহারাজ, আমি চুরি করে জঙ্গলের মধ্যে জিনিসপত্র রেখে গ্রামে গিয়ে দেখি সেখানে ধর্মকথা চলছে। আমি সন্ন্যাসীর মুখে শুনলাম কেউ যদি ভগবানের শরণ নেয় আর তারপর যদি সে প্রতিজ্ঞা করে যে আর কোনোদিন পাপ কাজ করবে না, তবে তার সব পাপ ভগবান ক্ষমা করে দেন আর তার নবজন্ম হয়। আমি ওখানেই বসে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আর কোনোদিন চুরি করব না। এখন আমি ভগবানের হয়ে গেছি আর আমার নতুন জন্ম হয়েছে। সুতরাং আমি এজন্মে চুরি করিনি। তাই আমার হাতও পোড়েনি। মহারাজ, আপনার বাড়িতে আমি চুরি করেছিলাম সে তো আমার পূর্ব জন্মের কথা।

রাজামশাই খুশি হয়ে তাকে রাজবাড়ির কথকঠাকুর নিযুক্ত করলেন।

**শম্ভুনাথ পাঠক**

## ভারতের বিপ্লবী

# আশালতা সেন

বিপ্লবী আশালতা সেনের জন্ম ১৮৯৪ সালে নোয়াখালিতে। ছোটোবেলা থেকেই তিনি লিখতে ভালোবাসতেন। ১৯০৫ সালে মাত্র এগারো বছর বয়সে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 'অনন্তপুর' মাসিক পত্রিকায় 'দেশের কবিতা' নামে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। এই সময় তাঁকে বিলাতি কাপড় বর্জনের সংকল্পপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ও তাঁর দলবল সুচারু ভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯১৬ তিনি বিধবা হন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৫ সালে কাটুনী সঙ্ঘের সদস্য হন এবং খদ্দর প্রচারে নিয়োজিত হন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে দিল্লিতে পুত্রের বাসভবনে তাঁর দেহাবসান হয়।

## জানো কি?

- রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বোনের নাম শান্তা।
- ভরতের স্ত্রীর নাম মাণ্ডবী।
- লক্ষ্মণের স্ত্রীর নাম ঊর্মিলা।
- শত্রুঘ্নর স্ত্রীর নাম শ্রুতকীর্তি।
- শ্রীরামের পুত্রের নাম লব ও কুশ।
- ভরতের পুত্রের নাম তক্ষ ও পুষ্কল।
- লক্ষ্মণের পুত্রের নাম অঙ্গদ ও ধর্মকেতু।
- শত্রুঘ্নর পুত্রের নাম সুবাহু ও শত্রুঘাতী।
- লক্ষ্মণ লক্ষ্মৌ শহর প্রতিষ্ঠা করেন।।
- শত্রুঘ্ন মধুপুর ও বিদিশার শাসক হন।

## ভালো কথা

# ভুটান

সারা বিশ্ব যখন 'পরিবেশ বাঁচাও' বলে চিৎকার করছে, তখন ভুটান বিশ্বের প্রথম কার্বনমুক্ত দেশ হিসেবে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। আর এটা তারা করেছে শুধুমাত্র বছরের পর বছর গাছ লাগিয়ে। ১৪ হাজার ৮০০ বর্গ মাইলের এই দেশটির ৭২ শতাংশ বনভূমি। ২০১৫ সালে এখানকার মানুষ মাত্র এক ঘণ্টায় ৪৯ হাজার ৬৭২টি গাছ লাগিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছিল। এখানে যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় তার থেকে অনেক বেশি বনাঞ্চল দ্বারা শোষিত হয়। ভুটানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় বছরে ১৫ লক্ষ টন আর শোষণের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টন। এখানকার সবাই পরিবেশ সচেতন। সবাই পরিবেশ-বান্ধব জিনিস ব্যবহার করে। এরা প্লাস্টিক ব্যবহার করে না আর যেখানে সেখানে আবর্জনাও ফেলে না।

**প্রিয়ব্রত রায়,** দ্বাদশ শ্রেণী, মালবাজার, জলপাইগুড়ি।

***তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।***

## কবিতা

# সর্দিকাশি

**বিদিশা পাল,** একাদশ শ্রেণী, ব্যারেজ কলোনি, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

এসেছে ফাগুন
রোদে আগুন
সকালে কুয়াশা
চারিদিক ধোঁয়াশা।
বাচ্চাদের সর্দিকাশি
মায়ের মুখে নেই হাসি,
বহু শিশু হাসপাতালে ভর্তি
কারও মনে নাই ফুর্তি।
মাস্ক পরতে হবে মুখে
ভিড়ে যাওয়া চলবে না,
হাত ধুতে হবে বারে বারে
যা তা খাওয়া চলবে না।
সবাই যদি নিয়ম মানে
অ্যাডিনো কাছে ঘেঁসবে না,
সব মানুষই থাকবে ভালো
অকালমৃত্যু হবে না।

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

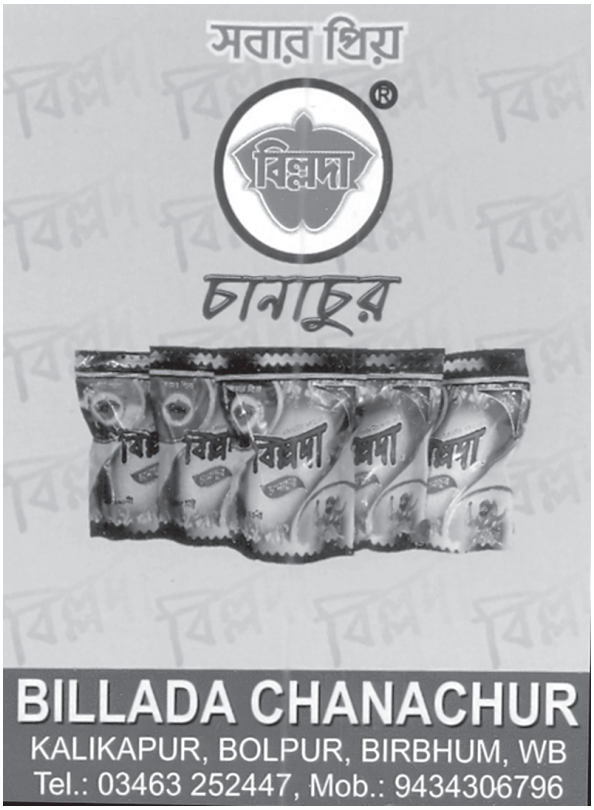


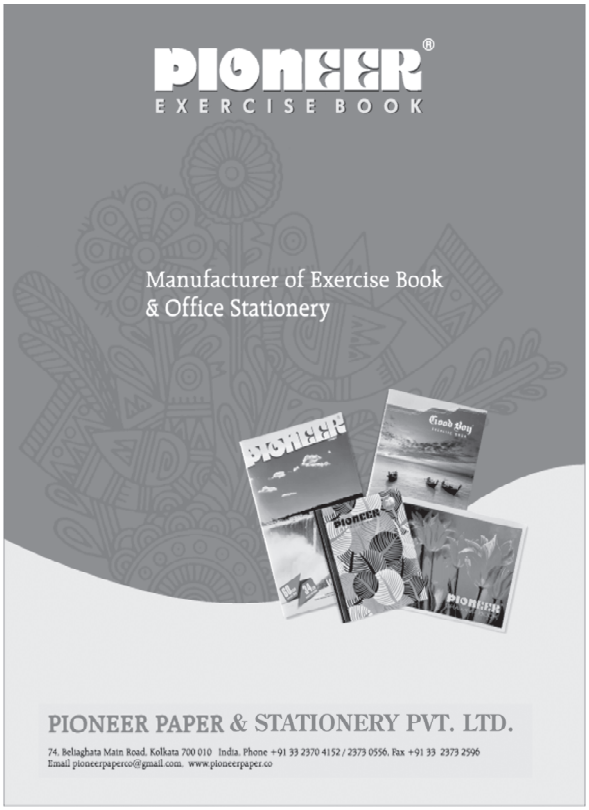


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

## বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের*
*ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

# নোটবাতিল মোদী সরকারের স্বাধীনতা পরবর্তী সর্ববৃহৎ আর্থিক সংস্কার

**ড. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়**

নোট বাতিলের ঠিক পূর্বসূরি হিসেবে মোদীজীর সরকার আরও দুটি আইনকে নিয়ে এসেছিল, (১) Indian Banking Insolovency and Bankruptcy Code (IBC) যা ২৮ মে, ২০১৬-তে এবং (২) Real Estate Registration Act (RERA), যা ২৫ মার্চ, ২০১৬-তে জারি করা হয়। প্রথমটি অনুযায়ী দেশে যে কোনো সংস্থা খুললেই তাকে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি আইনে নথিভুক্ত হতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো বেআইনি ভাবে, রাজনৈতিক মদতে গজিয়ে ওঠা সংস্থাগুলি যারা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে কোম্পানিকে দেউলিয়া ঘোষণা করে সেই ঋণ হয় মেরে দিত অথবা বিদেশে পাচার করে কালোটাকা সাদা করে আবার এদেশে নিয়ে আসতো, বৈদেশিক বা অনাবাসী বিনিয়োগের নামে, তাদের চিহ্নিত ও বাতিল করা। এতে মাঝখান থেকে ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণ (non-performing asset) বেড়ে যেত। এরা এমনকী কোম্পানি কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও মেরে দিত। ভারতে কালোটাকা বৃদ্ধির একটি বড়ো উৎস ছিল এরূপ সংস্থাগুলি যাদের Shell (ভুয়ো) কোম্পানি বলা হয়। নোট বাতিল পরবর্তী সময়ে এরূপ প্রায় ৫ লক্ষ ভুয়ো কোম্পানির হদিস পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৩ লক্ষ কোম্পানিকে deregistered করা হয়েছে অর্থাৎ লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং বেশ কিছু পরিচালককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

জমি-বাড়ির কেনা-বেচা অর্থাৎ real estate ক্ষেত্র ছিল কালো টাকা তৈরির আর একটি বড়ো উৎস। নগদে বিরাট পরিমাণ আর্থিক লেন-দেন হওয়ায় কেনা-বেচার কোনো তথ্য সরকারের কাছে থাকতো না, দামেও ইচ্ছামতো গরমিল করা হতো সরকারি কর ফাঁকি দেবার জন্য এবং সরকারি আধিকারিকদের মদতেই। RERA জারি করে দেশে যে কোনো সংস্থা জমি কেনা বা আবাসন নির্মাণের কাজ করলে তার বাধ্যতামূলক নথিভুক্তি (registration) যেমন আবশ্যিক করা হয়েছে, তেমনই নগদে ২ লক্ষ টাকার বেশি লেন-দেনও বেআইনি করা হয়েছে। কালোটাকা সৃষ্টির এই বিশাল ক্ষেত্রটিকে মোদী সরকার এইভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। একইভাবে রাজনৈতিক দলকে দেয় চাঁদা ছিল কালোটাকা সৃষ্টির আর একটি বড়ো উৎস। ২০১৭-এর বাজেটে আনা প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০০ টাকার বেশি এরূপ চাঁদা নগদে দেওয়া যাবে না। এর বেশি দিতে হলে ইলেকটোরাল বন্ড ব্যাংক থেকে কিনে নিতে হবে। পাশাপাশি মোদী সরকার সমানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশে ডিজিটাল লেন-দেন বাড়াতে। প্রথমত, অর্থব্যবস্থায় নগদ অর্থের পরিমাণ তথা অনুপাত কমিয়ে এবং দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ডিজিটাল অ্যাপ চালু করে জনগণকে, বিশেষত তরুণ সমাজকে, এ ব্যাপারে উৎসাহিত করার মাধ্যমে।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে মোদীজী আঁটঘাট বেঁধেই নোট বাতিলের রাস্তায় গেছিলেন যাতে তার সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ লাভ হয়। এবং তা হয়েওছে। কারণ রিজার্ভ ব্যাংকের হিসেব মতো ৯৯ শতাংশেরও বেশি বাতিল নোট ব্যাংক ব্যবস্থায় ফিরে এসেছে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে জমা পড়েছে যা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক বা রিজার্ভ ব্যাংক কেউই আশা করেনি। এর অর্থ হলো বিরাট পরিমাণ, প্রায় ৩০০ শতাংশ কর ও জরিমানা ধার্য হবে জেনেও কালোটাকার মালিকরা তাদের জমা অর্থ নষ্ট না করে ব্যাংকে জমা করেছে। এমনকী ৪ বছর এই টাকা তারা ব্যাংক থেকে তুলতেও পরবে না যা সরকার গরিব কল্যাণ তহবিলে নিয়ে খরচ করবে। এর পাশপাশি বিদেশে জমানো টাকার সন্ধান পাবার জন্য মোদীজী বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন, যার দরুন এখন বিদেশে টাকা পাঠানো বা জমানো, হাওয়ালা বা অন্যান্য অবৈধ উপায়ে, ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রে এনডিএ সরকার আসার আগে ঘটা বড়ো বড়ো আর্থিক দুর্নীতি মোদীজী সরকারে আসার পর উন্মোচিত হচ্ছে। ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাও যেমন চলছে, তেমনই এদেশে থাকা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্যাংকের টাকা মেটানোর ব্যবস্থাও হচ্ছে। একই সঙ্গে ব্যাংকের বিশাল পরিমাণ অনাদায়ী সম্পদ উদ্ধার করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি সচেষ্ট হয়েছেন এবং বিদেশের অনুকরণে তিনি

ফঃ ৬

ব্যাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে মোদীজী কোনো ফাঁকা আওয়াজ করেন না এবং যে কাজটি করেন সেটি নিজে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে, উপযুক্ত পরিকল্পনা করে, বলিষ্ঠতার সঙ্গে সম্পাদন করেন। নোট বাতিলের বিষয়ে তিনি একদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা করে গেছেন, যা সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে কালোটাকা সৃষ্টির সমস্ত ফন্দিফিকিরগুলিকে বন্ধ করেছেন, সঙ্গে পেয়েছিলেন বিচক্ষণ এক অর্থমন্ত্রীকে। ৯৯ শতাংশ বাতিল নোট ব্যাংকে ফিরে আসার অর্থ বিরোধীরা বুঝতেই পারলেন না। তাঁরা সমানে বলে গেছেন এর মধ্যে কালোটাকা কই? কালোটাকা যেন টাকার গায়ে লেখা থাকবে। যেখানে অর্থমন্ত্রক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা ছিল প্রায় ১৫.৮৬ লক্ষ কোটি বাতিল নোটের মধ্যে ৩ লক্ষ কোটি হয়তো ব্যাংকে ফিরে আসবে না, অর্থাৎ কালোটাকার মালিকরা কষ্ট করে ব্যাংকে এসে জমা করার বদলে তা নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু তারাও সরকারের উপর আস্থা রেখে তাদের কালোটাকা জমা করেছে, সুদ হীন সামান্য কিছু পাওনার বিনিময়ে, তাও চার বছর পর। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত মাত্র প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা ব্যাংকে ফিরে আসেনি যা নোটবাতিল প্রকল্পের বিরাট সাফল্য। বাতিল হিসেবে পাওয়া টাকা সরকার তথা ব্যাংকের হাতে বিরাট পরিমাণ তহবিল এনে দিয়েছিল যা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় নিয়োজিত হয়েছে ও হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সংঘটিত সমীক্ষায় নোট বাতিলের সাফল্য অনুমোদিত হয়েছে যেগুলিতে জনগণ নোট বাতিলকে কালোটাকা উদ্ধারের এক সৎ কিন্তু কষ্টকর প্রচেষ্টা হিসেবেই মেনে নিয়েছে।

**উদ্দেশ্য কী ছিল?**

নোটবাতিল নগদ জমায় থাকা কালোটাকাকে পৃষ্ঠতলে (surface) উঠে আসতে বাধ্য করে যা বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বিভিন্ন প্রশাসনিক আইনসমূহ ব্যবহার করেও সমর্থ হচ্ছিল না, যার মধ্যে ছিল দুর্নীতি দমন আইন (Prevention of Corruption Act) এবং ভারতীয় শাস্তি বিধান (Indian Penal Code)। তাই একটি অস্বাভাবিক ও অসাধারণ পদ্ধতির দরকার ছিল যা ১০০-এর মধ্যে ৩৬ নম্বর নিয়ে Corruption Perception Index 2015-য় ৭৬ নম্বরে থাকা, কালোটাকাপিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতির জরুরি ভিত্তিতে শুদ্ধিকরণ করতে পারবে যাতে মূলধন প্রবাহ এবং উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। একমাত্র কালো টাকা পৃষ্ঠতলে উঠে এলেই বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, যথা আয়কর দপ্তর, সিবিআই ও ইডি জমাকারীর টাকার হদিস ও সূত্র বার করে ফেলবে এবং আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন জমা খুঁজে পাবে। ভারতের মতো একটি বিশাল দেশে নতুন নোট ছাপিয়ে অর্থনীতির পুনঃ আর্থিকীকরণ (remonetisation), ATM গুলির ক্রমাঙ্কন (Calibration) এবং সেগুলিতে নতুন নোট পৌঁছিয়ে দেওয়া ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআই অত্যন্ত সফলভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদন করেছে। সুতরাং বলা যায় :

(১) নোট বাতিল ভারত সরকারের স্বাধীনতা পরবর্তী সর্ববৃহৎ আর্থিক সংস্কার রূপে অভিহিত হয়েছে যার লক্ষ্য হলো কালোটাকা, দুর্নীতি ও জালনোটের প্রসার রোধ করা। (২) যে সমস্ত দেশবাসী অসৎ পথে অর্থ রোজগার করেন না, তারা নোটবাতিলকে যথার্থ পদক্ষেপ বলে স্বাগত জানিয়েছেন। (৩) নোটবাতিল দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার পথ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কারণ অহিসেবি (unaccounted) টাকা হাতে রাখতে এখন কেউই চাইবে না। (৪) নোটবাতিল সরকারকে কালোটাকা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে, কারণ এরপর আর কালোটাকা অর্থনীতিতে প্রবাহিত হবে না এবং এই টাকা সরকারের কর সংগ্রহ বাড়াবে যা জনকল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হবে। (৫) নোটবাতিল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির অর্থ জোগান বন্ধ করবে যেগুলি হলো মূলত অ-হিসেবি ও জালটাকা এবং তার ফলে দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ হবে। (৬) অসৎ অর্থের সৎ অর্থে রূপান্তর (money laundering) বন্ধ হবে, কারণ অসৎ কাজ সহজেই চিহ্নিত হবে এবং ফলে অ-হিসেবি বা অসৎ অর্থ (dishonest money) ধরা পড়বে ও বাজেয়াপ্ত হবে। (৭) নোটবাতিল কালোটাকা ও জালটাকার চলা সমান্তরাল অর্থনীতিকে রোধ করবে। (৮) নোটবাতিল দেশকে নগদশূন্য বা নগদ কম অর্থনীতির দিকে চালিত করবে, যা ব্যাংকগুলিকেও নতুন নতুন ডিজিটাল পথের সন্ধান দেবে। (৯) অর্থনীতিতে ঊর্ধ্বমুখী দামের গতি ও মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা সরকার তথা ব্যাংকের হাতে পর্যাপ্ত অর্থের জোগান হ্রাস ঘটাবে এবং (১০) কর আদায় বাড়িয়ে আমাদের স্বল্প কর— জিডিপি অনুপাতকে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ বা OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) ভুক্ত দেশগুলির গড় পরিমাপের অন্তত সমান করতে হবে।

**সাফল্য :**

২০১৮ সালের আর্থিক সমীক্ষা জোর দিয়ে জানায় যে নোট বাতিলের নঞর্থক প্রভাবগুলি দূর হয়েছে এবং সদর্থক প্রভাবগুলি জোরদার হচ্ছে। নোট বাতিল রিয়েল এস্টেট, খামার আয় ও মজুরি, কারখানা বিনিয়োগ, প্রভৃতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল সন্দেহ নেই, যা অর্থনীতি পরবর্তী দুই বছরেই অনেকটা সামলে নেয়। কিন্তু নোটবতিলের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে থাকে আয়কর দাতার সংখ্যা এবং ডিজিটাল পেমেন্টের পরিমাণ, যা ছিল নোটবাতিলের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। আমরা নোটবাতিলের সাফল্যগুলিকে পরপর দেখি। (১) কালোটাকার ব্যাংকে ফিরে আসা— নোটবাতিল কি সফল হয়েছিল? এরকম একটি প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে প্রায়শই ঘুরপাক খায়। সরকারিভাবে বলা হয়, হ্যাঁ। সরকারের আর্থিক বিষয়ক সেক্রেটারি সুভাষ চন্দ্র গর্গ এমনই মনে করেন। গর্গ ব্যাখ্যা করেন, নোটবাতিল তার উদ্দেশ্যগুলো পর্যাপ্ত ভাবে পূরণ করেছে। মোট প্রচলিত অর্থে (কয়েন ও নোট) নোটের অংশ এখন ৮৭.৮৮ শতাংশ অর্থাৎ নোটবাতিল না হলে যে পরিমাণ নোট থাকতো তার থেকে ৩-৪ লক্ষ কোটি টাকা কম।

আর একটি যুক্তি হলো নোটবাতিল পরবর্তী সময়ে জালনোটের কারবারে আক্রমণ করা গেছে, কারণ আরবিআই-এর তথ্য অনুসারে জাল ৫০০ ও ২০০০ টাকা নোটের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৯.৭ শতাংশ ও ৫৯.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কালোটাকার বিষয়ে ২০১৭-এর

আগস্টে রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে যে, প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা যা নোটবাতিল পূর্ববর্তী সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে ছিল তা নোট বাতিল পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকে জমা পড়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা ছিল কালোটাকা বলে সরকারের অভিমত। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী আয়কর কর্তৃপক্ষ ব্যাংকে জমা পড়া ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার সন্দেহজনক তহবিল নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে। প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছিল যাদে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অর্থ ব্যাংকে জমা পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং জরিমানা-সহ কর আদায় কালোটাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্যকে পূরণ করেছে। (২) আয়কর দাতার সংখ্যায় বৃদ্ধি : The Indian Express-এর সমীক্ষা অনুযায়ী নোট বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ওই অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার সময় (৩১ মার্চ, ২০১৭) নতুন করদাতার সংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের ৮.৫৬ লক্ষ থেকে প্রায় ১০ গুণ বেড়ে ৮.৮০ মিলিয়ন বা ৮৮ লক্ষ-এ পৌঁছায়, যা ছিল ২০০০-০১ থেকে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি। ২০১৭-১৮ সালে নোটবাতিলের সদর্থক প্রভাবের কারণে আয়করের ভিত্তি আরও প্রসারিত হয় এবং ১.০৭ কোটি নতুন আয়কর দাতা যুক্ত হন এবং আরও ২৫.২২ লক্ষ সম্ভাব্য আয়কর দাতার সন্ধান পাওয়া যায় যারা কর রিটর্ন জমা দেননি। প্রত্যক্ষ কর সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা (Central Board of Direct Taxes -বা CBDT)-র হিসেব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ সালে রিটার্ন জমা দেওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ৬.৮৭ কোটি যা আগের বছর, ২০১৬-১৭ সালে ছিল ৫.৪৮ কোটি যা ছিল ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছিলেন নোটবাতিলের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে কর না দেবার (tax non-compliant) দেশ থেকে কর দেবার দেশে (tax compliant) নিয়ে আসা। এই প্রসঙ্গে নোট বাতিলজনিত স্বল্প সময়ের যন্ত্রণা বনাম অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং বিশ্বের দ্রুত উন্নয়নকারী দেশের তকমা পেতে চলা ভারতীয় অর্থনীতির দীর্ঘসময়ের লাভজনিত বিতর্কও অনেক দিন ধরে চলেছে। (৩) ডিজিটাইজেশন (digitisation) : গুগল, হোয়াটসঅ্যাপ প্রভৃতি বিশ্বের বড়ো বড়ো কারিগরি সংস্থা থেকে শুরু করে পেটিএম প্রভৃতি দেশের বৃহত্তম মোবাইল ওয়ালেটগুলি সবাই নোট বাতিলকালে ডিজিটাল পেমেন্ট বা লেন-দেন ব্যবস্থা আরোপ করেছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত, ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (Unified Payment Interface বা UPI) ব্যবস্থা ১.০২ ট্রিলিয়ন টাকা লেনদেন সংঘটিত করে (১ ট্রিলিয়ন = লক্ষ কোটি)। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে ২০২১ সালে ভারতে ৩,৯০০ কোটি ইউপিআই লেন-দেন হয়েছে, মূল্যের নিরিখে যা ৯৪,০০০ কোটি ডলার এবং জিডিপির নিরিখে যা ৩১ শতাংশ। অর্থাৎ উক্ত বছরে জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ টাকা ইউপিআই-এর মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে। ন্যাশনাল ইলেকট্রনিকস ফান্ড ট্রান্সফার (NEFT) ব্যবস্থায় ৯.৮৮ ট্রিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত লেন-দেন ঘটেছে। ২০১৫-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে মোবাইল ব্যাংকিং লেন-দেনেও বিপুল বৃদ্ধি ঘটে। ফলে সমস্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম একত্রে নোটবতিল সময় থেকে পরবর্তী দুই বছরে ডিজিটাল লেনদেন ৪৪০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। (৪) দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই— নোট বাতিলের পরবর্তী বছরের ১ জুলাই (২০১৭) প্রধানমন্ত্রী মোদীজী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টদের এক সভায় বক্তৃতাকালে তাদের নিজেদের বিবেকের দিকে তাকিয়ে সমাজ থেকে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ও তাদের কার্যক্রমকে দূর করতে, অর্থের বেআইনি লেন-দেন বন্ধ করতে, বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা কোম্পানিগুলিকে নির্মূল করতে এবং দেশ থেকে কর দেওয়ার অনীহার মনোভাব দূর করতে আহ্বান জানান। তিনি তাদের কাছে অনুরোধ করেন অসৎ করদাতা এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি সজাগ থাকতে। সুইস ব্যাংক কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি বলেন যে নোটবাতিলের পূর্ববর্তী ১ জুলাই সময়কালের তুলনায় ভারতীয়গণ কর্তৃক সেখানে তহবিল জমা ৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ৩ লক্ষ রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানি যেগুলি সরকারের কঠোর তথ্য নিরূপণের আওতায় সন্দেহভাজন বলে চিহ্নিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ভারতের মতো এত বড়ো অর্থনীতির ডিজিটাইজেসনের সমস্যা যেমন অনেকটাই গভীর, তেমনই কোটি কোটি মানুষের কাছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রসারও যথেষ্টই কঠিন। প্রধানমন্ত্রী বলেন এই দুটি বাধাই আমাদের অতিক্রম করতে হবে। (৫) ভুয়ো কোম্পানির অর্থ রূপান্তরের ব্যবসা বন্ধ করা : নোটবাতিলের পর শেল কোম্পানিগুলির উপর আঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও) সন্দেহজনক লেন-দেন করা শেল কোম্পানিগুলির চিহ্নিত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দল গঠন করে। Serious Fraud investigation Office (SFIO)-এর সাহায্যে তৈরি এই তালিকায় প্রাথমিকভাবে ৮০,৬৭০টি সংস্থার নাম ছিল যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এক বছরের মধ্যে ৩ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র, বলেন নভেম্বর, ২০১৬-তে করা নোটবাতিলের ফলে কালো টাকা একটি ঠিকানা খুঁজে পায় এবং পরের তিন বছরের মধ্যে ৫ লক্ষের উপর শেল কোম্পানি বাতিল বা বন্ধ করা হয়। শেল কোম্পানিগুলির উপর আঘাত ব্যাংকের অনাদায়ী সম্পদের পরিমাণ কমাবে এবং বিনিময়োগ সঠিক খাতে প্রবাহিত হবে। (৬) দুর্নীতি ও ছায়া অর্থনীতি : বিভিন্ন সংস্থা ভারতে ছায়া অর্থনীতি বা কালোটাকার পরিমাপ করেছে, যথা The National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) ১৯৮৩ সালে এর হিসেব করেছিল ৩১৫.৮৪ বিলিয়ন থেকে ৩৬৭.৮৪ বিলিয়ন টাকা (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) যা ছিল জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে ১৯-২১ শতাংশ; The World Bank Development Research Group-এর মতে ভারতে ২০১৩ সালে এর পরিমাপ ছিল ২০.৭ শতাংশ; ভারতের তিনটি অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা, Financial Intelligence Unit, Finance Ministry এবং Enforcment Directorate (ED), ২০১৩ সালে যৌথভাবে এর হিসেব করেছিল জিডিপির ৩০ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাংকের ২০১৫ সালের হিসেবে দেশে ছায়া অর্থনীতির পরিমাপ ছিল জিডিপির ২১ শতাংশ। তবে নোট বাতিলের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ভরতে ছায়া অর্থনীতির পরিমাপ কমবে জিডিপির নিরিখে,

২০১৬ এর ১৭.২২ শতাংশ থেকে ২০২৫-এ ১৩.৬ শতাংশে , যখন ছায়া অর্থনীতির বিশ্ব গড় দাঁড়াবে ২২.৫ শতাংশ। Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)-এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগের প্রধান সাজিদ খানের মতে ছায়া অর্থনীতির পরিমাপে পতনের অর্থ হলো সার্বিক ভাবে অর্থনীতির স্বাস্থ্য ভালো হওয়া যা নিয়োগ ও জিডিপির মাধ্যমে সূচিত হয়। Corruption Prception Index অনুযায়ী ভারতের স্থান বিশ্ব তালিকায় ক্রমাগত খারাপ হয়েছে, ২০০৬-এর ৭০তম থেকে ২০২১-এ ৯৫তম এবং ক্রমশ উচ্চ ক্ষমতাশালীদের দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শিক্ষা ও আয় অসমতা থেকে দারিদ্র্য তথা দুর্নীতির জন্ম হয় এবং তা বিস্তারিত হয়। এগুলি মানব উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। ভারতে আয় অসমতা সূচক হলো ১৮.৮ শতাংশ, যেখানে শিক্ষা অসমতা সূচক হলো ৩৮.৭ শতাংশ। ভারত সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থা বরাবরই একটি বিপজ্জনক ঘুষের সূত্র। এখানে ২০১৯ সালে সরকারি ক্ষেত্র দ্বারা মোট সংগ্রহ ছিল ১৫ থেকে ১৬.৬ ট্রিলিয়ন টাকার, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সংগ্রহ ছিল ২.৫ থেকে ৩ ট্রিলিয়ন টাকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মোট সংগ্রহ ছিল ১০ থেকে ১০.৬ ট্রিলিয়ন টাকার। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অফিস (United Nations Office on Drugs and Crime বা UNODC) তার সমীক্ষায় দেখায়, নগদে বা জিনিসে, সরকারি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঘুষ দেশে দেশে একটি বড়ো ভূমিকা নেয়। Corruption Perception Index অনুযায়ী ভারতে সরকারি দপ্তরের জন্য ৬০ নম্বর দেওয়া হয়েছে। এখানে ০ থেকে ১০০ নম্বরের সীমা আছে যা দুর্নীতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এই হিসাবে ভারতকে ২০২১ সালে দুর্নীতির নিরিখে ৮৪তম স্থান দেওয়া হয় যা বিশ্বব্যাপী গড় থেকে সামন্যই কম।

দুর্নীতি ও উন্নয়নের মধ্যে করা সময়ভিত্তিক বিভিন্ন সমীক্ষায় উৎপাদন বৃদ্ধির উপর দুর্নীতির সার্বিক নঙর্থক প্রভাবই প্রকাশিত হয়েছে। ২০১২ সালে আইএমএফ তার সমীক্ষায় উল্লেখ করে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই একটি দেশে উন্নয়ন ও সমষ্টিগত অর্থনীতির স্থিতাবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংক ২০১৭ সালে দেখায় যে দুর্নীতি কমানো কোনো দেশে স্বয়ংক্রিয় উন্নয়নের এবং তার জন্য অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের কেন্দ্রে থাকে। দুর্নীতি দূরীকরণ বিশ্বব্যাক গ্রুপ এবং এর অনেক সহযোগী দেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে রাখা হয়। দেশে দেশে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপগুলি এড়িয়ে জমা হওয়া অবৈধ অর্থের ভিত্তিতে যে বেহিসেবি সম্পদ জমা করা হয় তাতে আঘাত হানার জন্যই নোটবাতিল ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। নোটবাতিল কালোটাকার মালিকদের চিহ্নিত করে, দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের নিরুৎসাহিত করে এবং এইসবের ভিত্তিতে কর সংগ্রহ বৃদ্ধি করে। অবশ্য রাজনৈতিক আলোচনায় নোটবাতিলের যথার্থতা বিচার হয় লক্ষ লক্ষ আইনমানা নগদ অর্থ বা কর জমাকারীদের কষ্টভোগের ভিত্তিতে। যদিও অধ্যাপক জগদীশ ভগবতী প্রমুখ নোটবাতিলকে একটি সাহসী সংস্কার বলে বর্ণনা করেছেন যা দেশে ভবিষ্যতে অনেকগুলি সুবিধা নিয়ে আসবে।

(৭) স্বল্প-কর জিডিপি অনুপাত : ভারতে কর জিডিপি অনুপাত, যদিও ১৯৯০-৯১ থেকে ২০১৪-১৫ সময়কালে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ১২.৯২ শতাংশ থেকে ১৭.৪৫ শতাংশ হয়েছিল, তবুও OECD ভুক্ত দেশগুলির গড়ের তুলনায় তা ছিল অনেকটই কম। উদীয়মান অর্থনীতিগুলির গড়ের তুলনাতেও ভারতের কর— জিডিপি অনুপাত কম ছিল। বিশ্বব্যাংকের মতে এই ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হিসাবকে ৫-৭ বছরের জন্য মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক অনুপাত বলা যেতে পারে, যদিও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী তা পরিবর্তিত হয়। ভারতে স্বল্প কর ভিত্তি (tax base) এবং স্বল্প কর-জিডিপি অনুপাত আংশিকভাবে কর ফাঁকি দেবার কারণেই ঘটেছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে নগদ অর্থের প্রাধান্য ও লেন-দেন কর ফাঁকি বৃদ্ধির একটি বড়ো কারণ ছিল। বস্তুত স্বল্প কর-জিডিপি অনুপাত দেশে কর ফাঁকির সঙ্গে সঙ্গে কর এড়িয়ে যাবার প্রবণতাকেও নির্দেশ করে।

(৮) অর্থব্যবস্থার নবীকরণ : ২০১২-১৩ থেকে ২০১৪-১৫ ভারতে নোট প্রচলিত ছিল জিডিপির নিরিখে ১১.০৭ থেকে ১১.৭০ শতাংশ। আন্তর্জাতিক তুলনায় দেখা গেছে অনেক দেশে নোট প্রচলনের হার ছিল ভারতের থেকে কম। যেমন— অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও সংযুক্ত যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) এই অনুপাত ছিল ৩.৫২ থেকে ৩.৮০-এর মধ্যে। অন্যদিকে সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র (United States) বা আমেরিকায় এই অনুপাত ছিল সামান্য বেশি, ৮.২৬ শতাংশ। কারণ আমেরিকান ডলার হলো আন্তর্জাতিক মুদ্রা যার দরুন তার চাহিদাও বেশি। একই সঙ্গে ভারতের নগদ-জিডিপি অনুপাত চীন ছাড়া অন্যান্য BRICS (Brazil, Russia, India, China & South Sfrica) দেশের থেকেও অনেক বেশি। নোটবাতিল হলো একটি প্রক্রিয়া (tool) যার মাধ্যমে মুদ্রা প্রচলনে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যায়, বড়ো নোট ও ছোটো নোটের কাঙ্ক্ষিত মিশ্রণ ঘটিয়ে। কালোটাকা খুঁজে বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি নোটবাতিলের অরও দুটি উদ্দেশ্য ছিল, নোট পূরণ পর্বে (remonetisation) উচ্চমূল্যের নোট কমিয়ে নগদ-জিডিপি অনুপাত হ্রাস করা, এবং ডিজিটাল লেন-দেন বাড়ানো যা অসংগঠিত ক্ষেত্রে অ-নথিভুক্ত লেন-দেনের মাধ্যমে হয়ে চলা কর ফাঁকি কমাতে পারে। নোটবাতিলকে ভারতে সাফল্যজনক ভাবে উচ্চ মূল্যের নোট ও জিডিপির অনুপাতে ভারসাম্য আনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচলিত মুদ্রামূল্য ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের শেষে ২০.২ শতাংশ কমে ১৩,১০২ বিলিয়ন টাকা হয় যা ঠিক নোটবাতিল পূর্ববর্তী সময় ছিল ১৬,৪৬৫ বিলিয়ন টাকা। একইসঙ্গে উচ্চমূল্যের নোটের মূল্য ও পরিমাপ উভয়ই হ্রাস পায়, ২০১৬-র মার্চ থেকে ২০১৭-র মার্চ-এ, পরিমাণে ২৪.৪ থেকে ৯.২৩ শতাংশে এবং মূল্যে ৮৬.৩৮ থেকে ৭৩.২৮ শতাংশে। এর জন্য জনগণের মুদ্রা ব্যবহারে সুবিধা হবে এবং কালোটাকার উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে, কারণ কালোটাকা উচ্চমূল্যের নোটেই জমা করতে সুবিধা হয়। যদিও নোট বাতিল পরবর্তী সময়ে নোট প্রচলন পরিমাণে বেড়েছে, কিন্তু মূল্যের নিরিখে তা ২০.১৮ শতাংশ কমেছে যার দরুন নোচট প্রচলন-জিডিপি অনুপাত, মার্চ ২০১৬-র ১১.৭৭ শতাংশ থেকে মার্চ, ২০১৭-তে ৮.৫৯ শতাংশে কমে গেছে।

***(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)***

# হাইকোর্টের নির্দেশে পেনশনের আওতায় মানবাধিকার কমিশনের কর্মীরাও

**বিশেষ সংবাদদাতা॥** দীর্ঘ ২৮ বছর পর পেনশনের আওতায় এলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কর্মীরা। এতদিন তাঁরা অবসরকালীন যাবতীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রাক্তন কর্মী হিসেবে পেনশন কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্মীর মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশন কোনোটাই জুটত না।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৫ সালে বাম জমানায়। বাম সরকার কোনও কালেই মানবাধিকার কমিশনের কর্মীদের প্রতি সুবিচার করেনি বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মী। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ ১৬ বছরে কমিশনের কর্মীরা বঞ্চিতই ছিলেন। তৃণমূল সরকারের জমানায় মানবাধিকার কমিশনের কর্মীরা তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে বহু আন্দোলন করলেও আখেরে কোনও ফল হয়নি। তাদের পেনশনের ফাইল লাল ফিতের ফাঁসে বন্দি হয়েছিল নবান্নে। সম্প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশে মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মীদের ডেথ কাম রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটের (ডিসিআরবি) আওতায় আনতে বাধ্য হলো রাজ্য সরকার। যার জেরে স্বরাষ্ট্র সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা গত ১৩ ফেব্রুয়ারি এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। এই প্রসঙ্গে কমিশনের চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য জানান, 'এটা কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। বিষয়টা নিয়ে আগেই আদালতে মামলা হয়েছিল। হাইকোর্টের এই কর্মীবান্ধব রায়ে আমি খুশি। আগামীদিনে রাজ্য সরকারের মাধ্যমেই কমিশনে নয়া নিয়োগ হবে।"

ন্যায্য হারে ডিএ প্রাপ্তি নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা। মামলা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। আগামী ১০ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার চূড়ান্ত রায়। সেই আবহে হাইকোর্ট কর্তৃক মানবাধিকার কমিশনের কর্মীদের পেনশন চালুর নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

# দার-উল-ইসলামের লক্ষ্যে দক্ষিণ ভারতে সক্রিয় আইএস

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** দক্ষিণ ভারতে সক্রিয় রয়েছে আইএস জঙ্গিরা। একথা স্বীকার করে ইসলামিক স্টেটস ইন খোরাসান প্রভিন্সের (আইএসকেপি) মুখপত্র 'ভয়েস অব খোরাসান'-এ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে আইএস জঙ্গি সংগঠন। শুধু তাই নয়, ওই ম্যাগাজিনের ইংরেজি সংস্করণে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে খোলাখুলি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, গত বছর কোয়েম্বাত্তুর ও ম্যাঙ্গালুরুতে দু'টি বিস্ফোরণই ঘটিয়েছে আইএস জঙ্গিরা।

তবে দক্ষিণ ভারতের ঠিক কোন্ কোন্ রাজ্যে জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়েছে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু লেখা হয়নি ওই নিবন্ধে। ওয়াকিবহাল মহলের অবশ্য ধারণা, কেরলেই আইএস জঙ্গিদের ঘাঁটি গেড়ে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তবে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের কিছু অংশেও তারা ছড়িয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছে ভারতের নিরাপত্তা বিভাগ।

সূত্রের খবর, আইএস জঙ্গিদের খোঁজে দু'সপ্তাহ আগেই কেরল, তামিলাড়ু ও কর্ণাটকের ৭০ টিরও বেশি জায়গা জুড়ে তদন্ত চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। তারপরই ইসলামিক স্টেটস ইন খোরাসান প্রভিন্সের মুখপত্রে দক্ষিণ ভারতে তাদের জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় থাকার স্বীকারোক্তি ঘিরে আলোড়ন পড়েছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে মুখপত্রের সাম্প্রতিক সংখ্যায় হিন্দুদের পাশাপাশি কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি ও ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে ভয়েস অব খোরাসান। দার-উল-ইসলামের লক্ষ্যেই দক্ষিণ ভারতের মাটিতে আইএস জঙ্গিরা সক্রিয় হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে নিবন্ধে। একই সঙ্গে বাবরি ধাঁচা অপসারণ ও কাশ্মীর ইস্যুর পাশাপাশি গুজরাট হিংসার ঘটনাকে নিশানা করে প্ররোচনামূলক মন্তব্যও করা হয়েছে।

# পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হাল নিয়ে সোচ্চার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** এরাজ্যে শিক্ষার বেহাল দশা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। গত ৪ মার্চ দুর্গাপুরে ঝটিকা সফরে এসে তিনি বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে শয়ে শয়ে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষকের অভাবে। গ্রন্থাগারিক নেই, ১২০০

গ্রন্থাগার বন্ধ। ৩৭৫০ শূন্যপদে নিয়োগ নেই। শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি। কেরল, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক ভালো। এখানে পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে খরচ হচ্ছে না।''

এদিন এক চায়ের আড্ডায় শিক্ষক ও অভিভাবকদের রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন। প্রসঙ্গত, দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে বছর দুয়েক আগে প্রতিটি রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বিষয় রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। তাতে এরাজ্যের পাঠানো রিপোর্টে বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়গুলির শিক্ষকের চরম দুরবস্থার ছবি ধরা পড়ে। একই সঙ্গে নজরে এসেছে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত টেট কেলেঙ্কারি। তারই মধ্যে অতিমারী কোভিড পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রী সঙ্কটে ধুঁকতে থাকা ৯০টি সরকারি স্কুল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার।

করোনা আবহে সামাজিক দূরত্ববিধি বজায় রাখতে বন্ধ রাখা হয় স্কুলে। পড়াশোনার গতি বজায় রাখতে অনলাইন পঠনপাঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় প্রতিটি স্কুলকে। কিন্তু বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ জঙ্গলমহলের বহু স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরই মোবাইল ফোন না থাকার দরুন তারা বিপাকে পড়ে। ফলে সিলেবাসে পিছিয়ে গিয়ে অনেকে স্কুল ছেড়ে দেয়। অনেকে আবার সংসার চালাতে বাবা-মায়ের পাশে থাকার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছে। ফলে বিপুল সংখ্যক পড়ুয়ার স্কুল ত্যাগের ঘটনা জেরে সরকারি স্কুলগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এদিন বলেন, একসময় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা সারা ভারতের রোল মডেল ছিল। কিন্তু আগের বাম সরকারের এবং বর্তমান তৃণমূল সরকারের শিক্ষানীতির জন্য এরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ডুবতে বসেছে। প্রসঙ্গত, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক ধাক্কায় চার লক্ষ কমেছে। গত বছর যেখানে ১১ লক্ষ পরীক্ষার্থী ছিল, সেখানে এবছর পরীক্ষা দিয়েছে ৭ লক্ষ।

# ভোটের আগে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে সংশয়ে পুলিশ

**বিশেষ প্রতিনিধি॥** ভোটের আগে এরাজ্যে বেআইনি অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে পুলিশের অন্দর মহলে। পুলিশ সূত্রে দাবি, কোথায় তৈরি হয়ে কীভাবে কোন্ পথে কত পরিমাণ বেআইনি অস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে তার নাড়ি নক্ষত্র জানে তারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেসব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পঞ্চায়েত ভোটের মুখে বেআইনি অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে খোদ পুলিশ-প্রশাসনের অন্দরেই। একাধিক পুলিশ কর্তার দাবি, পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া বেআইনি অস্ত্রের কতটুকু পঞ্চায়েত ভোটের আগে বাজেয়াপ্ত করা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দিহান তারা।

অন্য রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে যেসব অস্ত্র এখানে ঢুকেছে তা পৌঁছে যাচ্ছে প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকা দুষ্কৃতীদের হাতে। ফলে ওইসব অস্ত্র এবং তার ব্যবহারকারীরা পঞ্চায়েত ভোটে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। রাজ্য পুলিশের এসটিএফ এবং সিআইডি'র এসওজি মূলত আগাম পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বোমা, অস্ত্র উদ্ধার করে থাকে। অভিযোগ, সিআইডি এবং এসটিএফের 'সোর্স মানি' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার প্রভাব পড়ছে অস্ত্র, বোমা এমনকী মাদক উদ্ধারের কাজকর্মেও। রাজ্য পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'এসটিএফ বা সিআইডি'র গোয়েন্দারা সোর্স মারফত খবর পেয়েই অভিযানে নামেন। কিছু ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে এই সব গোপন খবর পাঠান। সেই টাকায় তাদের সংসার চলে। অনেকের কাছে এটাই পেশা। ফলে টাকার জোগান কমে গেলে বা বন্ধ হলে আসল কাজে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।'

বিশেষ সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের রাজমহল, পাকুড়ের দিক থেকে নদী পেরিয়ে বা কখনও রেলপথে আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে মালদা-মুর্শিদাবাদে। আবার বাসে দুমকা থেকে আসানসোল, বীরভূমের মহম্মদ বাজারে অস্ত্র পৌঁছোচ্ছে। ট্রেনে বিহারের মুঙ্গের, ভাগলপুর থেকে অস্ত্র ঢুকছে নলহাটি, বর্ধমান, ব্যান্ডেল, রামপুরহাট স্টেশন পর্যন্ত। গোপন তথ্য, অকুস্থল সবই জানা আছে রাজ্য পুলিশের। অথচ শুধুমাত্র সোর্সের অভাবে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে পারছে না পুলিশ। এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা ঔদাসীনতার দিকেই আঙুল তুলেছে বিশেষজ্ঞ মহল।

# ভারতে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি পাবে ১০ শতাংশ, দাবি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়

**পিআইবি ॥** চলতি বছরে ভারতের বিভিন্ন সংস্থায় থাকা কর্মীদের ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিল আন্তর্জাতিক সমীক্ষা সংস্থা উইলিস টাওয়ার্স ওয়াটসন(ডব্লিউটিডব্লিউ)। তাদের একটি সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, গত বছরে এদেশের কর্মীদের বেতন ৯.৮ শতাংশ হারে বেড়েছিল। সে দিক দিয়ে বিচার করলে এশিয়া-প্যাসিফিক দেশগুলির মধ্যে ভারতেই কর্মীদের সবচেয়ে বেশি বেতন বৃদ্ধি হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা, ব্রোকিং সংস্থাটির 'স্যালারি বাজেট প্ল্যানিং সার্ভে' অনুযায়ী, চীনে কর্মীদের বেতন ৬ শতাংশ হারে বাড়বে। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, হংকং এবং সিঙ্গাপুরে যথাক্রমে ৮ শতাংশ, ৭ শতাংশ এবং ৪ শতাংশ করে বাড়বে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রগুলিতে কর্মীদের বেতন বাড়বে তা উল্লেখ করেছে ডব্লিউটিডব্লিউ। আর্থিক পরিষেবা, টেক মিডিয়া ও গেমিং, ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়ো টেকনোলজি এবং রাসায়নিক ও রিটেল ক্ষেত্রে যে সকল কর্মী রয়েছেন তাদের বেতন ১০ শতাংশ হারে বাড়বে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে উপদেষ্টা সংস্থাটি।

ভারতে সংস্থার কনসাল্টিং লিডার (ওয়ার্ক অ্যান্ড রিওয়ার্ড) রাজুল মাথুর বলেন, ভারতে বেতন বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবসা বিস্তারের সুযোগ এবং প্রতিভাবান কর্মীদের ধরে রাখার মানসিকতা কাজ করবে। তবে সংস্থাগুলিকে খুব গভীরভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের গতিপ্রকৃতির ওপর নজর রাখতে হবে। দেশের কাজের বাজারের ওপর নজর দিতে হবে। তারপরেই বেতন সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তুত করা দরকার।

বিগত ৮ বছরে ভারতীয় সংস্থাগুলি কর্মীদের বেতন বাড়ানোর ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। পাশাপাশি কর্মীদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, কর্মক্ষেত্রে উন্নত এবং ভালো অভিজ্ঞতা দেওয়ার ব্যবস্থা, পেশাগত উন্নতি, কাজ ও কাজের গতি সামলানোর জন্য সহযোগিতার বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছে। যার জন্য সবদিক বিশ্লেষণ করে আগামী ১২ মাসে ভারতের ৮০ শতাংশ সংস্থার আয় বাড়ছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউটিডব্লিউ।

| Market | 2022 actual salary increases | 2023 projected salary increases |
|---|---|---|
| Australia | 3.0% | 3.0% |
| China | 6.0% | 6.0% |
| Hong Kong | 3.8% | 4.0% |
| India | 9.5% | 10.0% |
| Indonesia | 6.7% | 7.0% |
| Japan | 2.5% | 2.6% |
| Malaysia | 4.8% | 5.0% |
| New Zealand | 3.0% | 3.0% |
| Philippines | 5.5% | 5.7% |
| Singapore | 3.9% | 4.0% |
| South Korea | 4.3% | 4.5% |
| Taiwan | 3.7% | 3.9% |
| Thailand | 4.8% | 5.0% |
| Vietnam | 7.8% | 8.0% |

Source: WTW 2022 Salary Budget Planning Survey Report – Asia Pacific (July 2022 edition)
Median salary increases by market including zeros

# দেড় লক্ষ কোটির জিএসটি আদায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে ভারতে জিএসটি খাতে রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা। এই নিয়ে টানা ১২ মাস জিএসটি আদায় ১.৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হলো জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে জিএসটি আদায় হয়েছিল ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৬ কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে পণ্য আমদানি থেকে গত বছরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। ঘরোয়া লেনদেন থেকে রাজস্ব আদায় গত বছরের ফেব্রুয়ারির তুলনায় বেড়েছে ১৫ শতাংশ। গত মাসে মাসিক সেস সংগৃহীত হয়েছে ১১,৯৩১ কোটি টাকা। ভারতে জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে যা সর্বাধিক। সাধারণত ২৮ দিনের মাস হওয়ায় ফেব্রুয়ারিতে জিএসটি আদায় তুলনামূলকভাবে কম হয় বলে জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রক। গত ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করেন। সেখানেই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য নিট জিএসটি আদায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধির অনুমান করেছিলেন। চলতি অর্থ বর্ষে সরকারের লক্ষ্য মোট ৮.৫৪ লক্ষ কোটি টাকার জিএসটি আদায় করা।

কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও সীমা শুল্ক পর্ষদের চেয়ারম্যান বিবেক জোহরি জানিয়েছেন, 'মাসিক ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা জিএটি আদায় এখন 'নিউ নর্মাল' হয়েছে। চলতি বছরে তাঁরা লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। জিএসটি খাতে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বিবেক জোহরির ব্যাখ্যা, এবছর রিটার্ন ফাইলিং ও কমপ্লায়েন্স উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। চলতি ফেব্রুয়ারিতে মোট জিএসটি আদায়ের মধ্যে সিজিএসটি, এসজিএসটি, ও আইজিএসটি খাতে সংগৃহীত হয়েছে যথাক্রমে ২৭,৬৬২ কোটি, ৩৪,৯১৫ কোটি এবং ৭৫,০৬৯ কোটি টাকা।

## ।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৩৫।।

*পরদিন প্রভাতেই মিসেস ও মি: প্রপসন দরজা খুলে দেখলেন, স্বপ্নে দেখা সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। তিনিই মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী।*

*দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল **World Fellowship of Faiths**। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব শান্তি-মৈত্রী, রাজনীতি, দর্শন, জাতিতত্ত্ব, যুব সমাজ ইত্যাদি সব বিষয়ে আলোচনা। সকলের মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বমৈত্রী গড়ে তোলা।*

*(ক্রমশ)*